প্রথম অধ্যায়ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী উন্নয়ন প্রয়াস

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের একটি মুখ্য ধারা ছিল নারীর অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা। বিষয়টি কয়েকটি উপধারায় বিভক্ত। বস্তুত নারীর সামাজিক দুর্গতির পিছনে বর্তমান ছিল বহুবিধ কারণ এবং তা নিবারণের জন্য প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালাবার প্রয়োজন হয়।

ঊনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় রাজনৈতিক বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশে রাষ্ট্রিক কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কোনো তারতম্য ঘটেনি। অবরোধপ্রথা, শিক্ষাহীনতা, সতীপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ ও উপপত্নীপালন, স্বামী ও পিতার নিরঙ্কুশ আধিপত্য, সম্পত্তিতে অনধিকার, বিধবার আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন----এই সবই বঙ্গনারীর জীবনকে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ভাবে পঙ্গু করে রেখেছিল। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজ পুরুষকে দিয়েছিল অবাধ অধিকার এবং নারীকে বঞ্চিত রেখেছিল প্রায় সব অধিকার থেকে। কন্যাজন্ম ছিল অবাঞ্ছিত। সুতরাং জন্ম থেকেই একটি মেয়ের জীবন অবহেলা, অপমান ও লাঞ্ছনা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে নারীর সামাজিক অবস্থার অবমূল্যায়ন চরম সীমায় পৌঁছায়। কিন্তু এই দুরবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা তো দূরের কথা,এর জন্য দুঃখবোধের কোনো পরিচয়ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না।[১] কিন্তু ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থকে এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে সরব কণ্ঠস্বর শোনা যেতে থাকে এবং ক্রমশ নারীর দুরবস্থার প্রতিকারসাধনে কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

মানুষের জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে এই সময় চেতনার উন্মেষ দেখা যায় এবং স্ত্রী জাতিরও যে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা দাবি আছে এবং এই দাবি পূরণ না হলে যে সমগ্র সমাজের কল্যাণ সম্ভব নয়, এই বোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী উন্নয়ন আন্দোলন প্রধানত সতীদাহ উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বাল্যবিবাহনিবারণ, বহুবিবাহনিষিদ্ধকরণ, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অধিকার আদায় প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়।[২]

জীবিকার জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয় বলে আমদের সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারী সমাজ পুরুষের অধীনে রয়ে গেছে। অভ্যাসবশত ক্রমে পরাধীনতাই সম্মানজনক বলে সকলের এবং মেয়েদেরও বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়। বৃহত্তর সামাজিক আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে নারীর জীবন শুধু গৃহবন্দী হয়ে পড়ে। সামাজিক বিধি,

রীতি, আইন, সব কিছুর ভিতরেই নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রতিফলিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে নারীও হয়ে যায় পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারকরা যে সমস্যাগুলি নিয়ে বিশেষ বিব্রত ছিলেন এবং যেগুলির সমাধানকল্পে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলেন তার অনেকগুলিই ছিল বিবাহকেন্দ্রিক।[৩] যদিও স্বামীস্ত্রী সন্তানকেন্দ্রিক পরিবার সমাজবিন্যাসের মূল একক, কিন্তু বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবার-সংগঠনের গুণগত উৎকর্ষের ক্রমিক অবনমন ঘটিয়ে যাচ্ছিল। সমাজের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে, অতএব, অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল পারিবারিক সামঞ্জস্যের পুনঃপ্রবর্তন। প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিবাহ যদি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত সম্পর্কেও যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই সেই সামঞ্জস্যের পুনর্বিন্যাস সম্ভব। উপরোক্ত গ্লানিময় প্রথাগুলির প্রবল প্রতাপ বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত সম্বন্ধস্থাপনের প্রধান অন্তরায় ছিল।[৪]

ঊনবিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও অংশগ্রহণকারীগণ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী অংশ হলেও সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিলেন না। শুধু সনাতন প্রথায় শিক্ষিত মানুষ নয়, অনেক ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিও এই অন্দোলনের বিরুদ্ধে ও বিপক্ষে ছিলেন।[৫] তাছাড়া এই সংস্কার আন্দোলনের বিষয় ছিল প্রধানত হিন্দু নারী। এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, সমাজ-সংস্কারে আগ্রহী প্রগতিপন্থী হিন্দু বা অধিক প্রগতিবাদী ব্রাহ্মগণ তৎকালীন বঙ্গদেশের সর্বাপেক্ষা উন্নত সম্প্রদায় ছিলেন। দ্বিতীয়ত, অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে মুসলিম মেয়েরা সংস্কারকদের দাবিকৃত অধিকারগুলির কিছু কিছু আগে থেকেই ভোগ করছিলেন, যেমন— বিধবাবিবাহ, তালাক, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি। তাছাড়া মুসলিম সমাজে সহমরণ প্রথার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায় সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অবনতির দিকে যায় এবং তাদের পুনর্জাগরণ ঊনিশ শতক শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত থাকে।[৬]

(ক)

সতীপ্রথা উচ্ছেদ

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে ভারতের প্রাচীনতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থে জীবনের লক্ষ্য যদিও উচ্চারিত হয়েছে বাঁচবার মন্ত্রে, মরবার জন্য নয়, তবুও অদ্ভুত ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রে এখনেই স্মৃতিশাস্ত্রে মৃতপতির সঙ্গে তাঁর বিধবাপত্নীর চিতারোহণের প্রশংসা করা হয়েছে।[৭] কালক্রমে এই প্রথা সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথা হয়ে ওঠে বংশানুক্রমিক। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরবর্তী কতগুলি স্মৃতিশাস্ত্রে (আঙ্গিরস, বৃদ্ধহারীত) সহমৃত স্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এর দ্বারা প্রলুব্ধ

হয়ে ও অনন্ত পুণ্যের আশায় বহু নারী স্বেচ্ছায় সহমৃত হতে থাকেন। এছাড়া বিধবাজীবনের সম্ভাব্য দুঃখলাঞ্ছনাও অনেক সদ্যোবিধবাকে সহমরণে প্রবৃত্ত করত। স্বামীর মৃত্যুকালে দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী স্ত্রী কিংবা স্ত্রীগণ স্বামীর ব্যবহৃত যে কোনো জিনিস— পাদুকা, লাঠি, চাদর ইত্যাদিসহ চিতারোহণ করতেন। একে বলা হত অনুমরণ। অনুমরণকারী নারীও সহমরণকারীর মতোই 'সতী' বিবেচিত হতেন। অর্থাৎ অনুমরণ ছিল সহমরণেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। সহমরণকালে এলাকার অসংখ্য অন্য সধবা মহিলা শ্মশানে উপস্থিত সতীর পদধূলি গ্রহণ করতেন ও পায়ের আলতার ছাপ সযত্নে রক্ষা করতেন। সতীর কীর্তি চিরস্থায়ী করবার জন্য স্তম্ভ বা মন্দির নির্মিত হত। সাধারণ হিন্দুনারীর চোখে সতীর এই মহিমার নিদর্শনও অনেককে সহমরণে প্রবৃত্ত করত। দায়ভাগের বিধান অনুসারে অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুর পরে যৌথ পরিবারে উক্ত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার স্ত্রীর প্রাপ্য ছিল। সম্পত্তির অন্য শরিকরা বিধবার সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সহমরণে উৎসাহিত করত।[৮] বিধবাকে বলপূর্বক চিতায় বেঁধে রাখা বা বাঁশ দিয়ে চেপে রাখা যেন সে পালাতে না পারে, এমন ঘটনা বিরল ছিল না।[৯] বিধবা মেয়ে পুনরায় বিবাহ করলে বা পরিবার ত্যাগ করলে পারিবারিক সম্মান বিধ্বস্ত হত। সেই সম্ভাবনা যাতে আদৌ না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে সতী প্রথার মতো লোমহর্ষক নির্বিচার নারী হত্যাকাণ্ড সমাজে অবাধে প্রচলিত ছিল।[১০]

কারণ যাই হোক, ঘটনা এই যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে সহমরণপ্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ১৮১৫ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শুধু বর্ধমান, হুগলী, জঙ্গলমহল, নদীয়া ও কলকাতা শহরতলীতে মোট ৮৬৪ টি সতীদাহ হয়। অথচ ব্রিটিশ ভারতের বাকি অংশে মোট সতীর সংখ্যা ছিল ৬৬৩।[১১] শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সতী ঘটনার এক তালিকায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ ছাড়াও জেলে, সেকরা, মালী, কাঁসারী, কামার, চাষী, তেলী বিধবাও সতী হয়েছেন।[১২] আঠারোজনের এই তালিকায় ব্রাহ্মণ মাত্র আটজন। সাধারণ বাঙালির মধ্যে সতী হবার প্রবণতা এই তত্ত্বই প্রমাণ করে যে উচ্চবর্ণে প্রচলিত আচার ব্যবহার ও প্রথাকে মান্য করেই অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণে সামিল হবার চেষ্টা করে।[১৩] ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলায় মোট ১৪১ জন সতীর মধ্যে ৪০জন ব্রাহ্মণ, ২৬জন কায়স্থ, ৪১জন বৈদ্য, বাকিরা অন্যবর্ণের। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণায় সতীর সংখ্যা ৫২-- ব্রাহ্মণ ২০, কায়স্থ ১০, বৈদ্য ২, বাকি অন্যান্য।[১৪]

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সরকারি উদ্যোগে সতীর বাৎসরিক হিসাব তৈরী হতে থাকে। এই হিসাবগুলি পরীক্ষা করলে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। দেখা যায় সর্বাধিক সতীর ঘটনা ঘটেছে কলকাতা বিভাগে (বর্ধমান, মেদিনীপুর, জঙ্গলমহল, যশোর, নদীয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা বারাসত এবং কলকাতা শহরতলী— এই নয়টি অঞ্চল তৎকালীন কলকাতা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত)। এর মধ্যেও হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণা ও কলকাতার শহরতলীতে সতীর ঘটনা সর্বাধিক। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রাজসাহী ইত্যাদি অঞ্চলে সতী প্রায় অনুপস্থিত এবং মুর্শিদাবাদ ও মালদহে সতীর সংখ্যা অতি অল্প। ১৮১৫

থেকে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ এই চোদ্দ বছরে কলকাতা বিভাগে সতীর সংখ্যা ৫১১৯, ঢাকা বিভাগে ৭১০, মুর্শিদাবাদ বিভাগে ২৬০।[১৫]

সতীপ্রথা যে প্রকৃতপক্ষে নরহত্যা এবং এর বীভৎসতা যে বন্ধ হওয়া উচিত এবিষয়ে প্রাক্‌ব্রিটিশযুগে কখনো কখনো উদ্যোগ দেখা গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই প্রথা আইনত বন্ধ করা যায়নি। তিনটি কারণে এই সময় আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ সম্ভব হয়। প্রথমত, কোম্পানী সরকার এই সময় প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এই প্রথা রহিত করার জন্য তৎপর হয় অথচ এপর্যন্ত কোম্পানী প্রজাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টান মিশনারীগণ বহুদিন ধরে এই নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন। তৃতীয়ত, বাংলার এক শ্রেণীর মানুষের মনে এই সময় সামাজিক কুপ্রথাগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা জাগছিল।

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিকে কোম্পানী এদেশের পুরাতন আইন, প্রথা এবং রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ না করার মনোভাব অবলম্বন করে। অবশ্য যতদিন এগুলি ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবে বিবেচিত না হত ততদিন পর্যন্তই এই নীতি চলে। সুতরাং ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা যে হিন্দু আইন বিধি সঙ্কলিত হয় তাতে সতীপ্রথা সমর্থিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় নিযুক্ত ইংরেজ অফিসাররা প্রায়ই এই নৃশংস প্রথাটি সম্বন্ধে নির্বিকার থাকতে পারতেন না। তাছাড়া খ্রীষ্টান মিশনারীরা ইংলণ্ড ও ভারতে এই বর্বর প্রথাটির বিরুদ্ধে অনবরত প্রতিবাদ করেন এবং সরকার এই প্রথাটিকে প্রশ্রয় দেন এমন কঠোর সমালোচনাও করেন। এর ফলে সরকারকে অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন আনস্টুথার সুপ্রীম কোর্টের এলাকার মধ্যে সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। ফলে সতী হতে ইচ্ছুক কলকাতার মেয়েরা শহরতলীতে গিয়ে সতী হতেন। অনুরূপ ভাবে দিনেমার এলাকা শ্রীরামপুর, ওলন্দাজ এলাকা চুঁচুড়া ও ফরাসী এলাকা চন্দননগরে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ থাকায় ইচ্ছুক মেয়েরা ঐসব এলাকাবহির্ভূত স্থানে গিয়ে সতী হতেন।[১৬]

এদিকে মিশনারীরা সতীদাহ সম্বন্ধে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করতে থাকেন। অতঃপর সরকার প্রথাটি সরাসরি রহিত না করে এর প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর নির্দেশে ভারত সরকারের বিচারবিভাগের সেক্রেটারি ডড্‌সওয়েল সাহেব সদর নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রার গুড সাহেবকে আদালতের পণ্ডিতদের কাছে এই প্রথা হিন্দু ধর্মানুমোদিত কিনা তা অনুসন্ধান করবার জন্য ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারী এক চিঠি লেখেন। নিজামত অদালতের প্রধান পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে--

হিন্দু সমাজে চারবর্ণের সব নারীর স্বামীর সঙ্গে সহমৃত হবার অধিকার আছে। কিন্তু কারো যদি অত্যন্ত ছোট শিশুসন্তান থাকে কিংবা কেউ যদি অন্তঃসত্ত্বা বা ঋতুকালীন অবস্থায় থাকে, অথবা কেউ যদি নিজে নাবালিকা হয় তবে সে সহমৃত হবার যোগ্য নয়। কোনো উৎকট ওষুধ বা মাদক সেবন করিয়ে কোনো নারীকে সহমরণে

উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। ঘনশ্যাম আরো বলেন যে সহমরণের পূর্বে স্ত্রীলোককে সঙ্কল্প করতে হয় ও অন্যান্য কতগুলি বিধির অনুষ্ঠান করতে হয়।[১৭]

অন্যান্য পণ্ডিতরাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। সেই অনুসারে সদর নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রারের কাছে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ ডিসেম্বর সরকার এক নির্দেশ প্রেরণ করে জানান যে দেখা যাচ্ছে সতী প্রথা সাধারণভাবে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। সরকার কারও ধর্মমতের উপর হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক। সুতরাং যেখানে সতীদাহ শাস্ত্রবিধিমতে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সরকারের অনুমতি থাকবে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে সতীদাহ শাস্ত্রবিধিসঙ্গত নয় সেখানে সরকার বাধা দেবে। দেখা যাচ্ছে সতীপ্রথা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলে সরকার প্রথাটিকে যেন আইনসঙ্গত করে তোলেন।[১৮]

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার প্রদত্ত আদেশবলে ম্যাজিস্ট্রেটরা সতী সম্বন্ধে পুলিশ দারোগাদের কয়েকটি নির্দেশ দেন— কাকেও বলপ্রয়োগে বা মাদকসেবনে সতী করা যাবে না, ১৬ বছরের নিচে বা গর্ভবতী কোনো মেয়ে সতী হতে পারবে না। উপরোক্ত শর্তগুলি পালিত হচ্ছে কিনা তা পুলিশ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র তদন্ত করবে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারি আদেশে ম্যাজিস্ট্রেটদের নিজ নিজ এলাকার সতীর একটা হিসাব ও তালিকা প্রতিবছর সরকারকে জমা দিতে বলা হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহের উপর আরো কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।[১৯]

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান পণ্ডিতের কাছে সতীর শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা জানতে চান। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মত দেন যে কোনো শাস্ত্রেই বিধবার সহমরণকে অত্যাবশ্যক ঘোষণা করা হয়নি। বরং বিধবার ব্রহ্মচর্যপালন ও কৃচ্ছ্রসাধন অধিকতর পবিত্র। তাঁর মতে শাস্ত্রে সতীবিরোধী বহু নজির আছে, কিন্তু বিধবার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও ব্রহ্মচর্যের পবিত্রতার বিরুদ্ধে একটিও নিষেধ নেই।[২০]

তৎকালীন সমাজে পণ্ডিত হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। তিনি যখন মত দিলেন যে সহমরণ হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অবশ্যপালনীয় বিধান নয় তখন অন্য কোনো পণ্ডিতের পক্ষে তাঁর মতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। সংস্কারপন্থী হিন্দুগণ, যাঁরা সতীপ্রথা উচ্ছেদ করতে আন্দোলন করেন, তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহিত হন। মৃত্যুঞ্জয় এই মত পণ্ডিত হিসাবে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সতীপ্রথা উচ্ছেদ সমর্থনকারী গোষ্ঠীতে ছিলেন না এবং আমৃত্যু রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী সতীর তালিকায় দেখা যায় ১৮১৫তে ৩৭৮, ১৮১৬-তে ৪৪৪, ১৮১৭-তে ৭০৭ এবং ১৮১৮-তে ৮৩৯ জন মেয়ে সতী হয়। সতীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে বলা হয় যে সতর্ক পুলিশী নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্টদাখিলের তৎপরতাবৃদ্ধিই এর কারণ। এছাড়াও মনে করা হয় যে সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে সতীপ্রথা সীমাবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বরং এর মর্যাদা ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।[২১]

বাংলার অন্যতম পুলিশ সুপার ওয়াল্টার ইউয়ার সরকারের বিচারবিভাগীয় সেক্রেটারিকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এক চিঠিতে এই বর্বর প্রথাটির বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রদর্শন করে জানান যে প্রথাটি উচ্ছেদ করলে হিন্দুদের মধ্য থেকে তেমন কোনো বাধা আসবে না। সদর নিজামত আদালতের দ্বিতীয় বিচারপতি কোর্টনি স্মিথ ১৮১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দের সতীর তালিকা সরকারের কাছে পেশ করবার সময় বলেন এই প্রথা সহ্য করা সরকারের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ এবং একে নিষিদ্ধ করলে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য হ্যারিংটন এবং স্মিথও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সদর নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতি লেসেস্টার সাবধানী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বলেন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি যেসব অঞ্চলে সতীপ্রথার বিশেষ প্রচলন নেই সেখানে এই প্রথা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। অন্যান্য বিচারপতিরা বলেন যে মানবতার দিক দিয়ে প্রথাটি সমর্থনযোগ্য না হলেও এটি নিষিদ্ধ করলে দেশীয়দের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তবে অন্যতম বিচারক মিঃ ডোরিন প্রস্তাব করেন যে পরীক্ষামূলকভাবে কোনো জায়গায়, যেমন হুগলী জেলায়, এটি নিষিদ্ধ করে তার ফলাফল লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা আংশিক নিষিদ্ধকরণ, কোনো প্রস্তাবই সমর্থন করেন না এবং বলেন (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ ১৭ জুলাই) ক্রমশ শিক্ষিত হয়ে দেশীয়রা নিজেরাই প্রথাটি প্রত্যাখ্যান করবে।[২২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও নিজামতের বিচারপতিগণ সতী সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগ্রহণে দ্বিধাবিভক্ত। ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদকগণও সতী নিষিদ্ধ করার বিষয় দ্বিধাবিভক্ত। ক্যালকাটা গেজেট, ক্যালকাটা জার্নাল, বেঙ্গল হরকরা, বেঙ্গল ক্রনিকল্, ইণ্ডিয়া গেজেট, ওরিয়েন্টাল অবজার্ভার, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া,--- প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এই প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী হলেও "জন বুল" আইনের সাহায্যে এটি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে পারেনা।[২৩]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের পরিচলকবর্গও ভারতসরকারকে এই বিষয়ে কোনো নির্দেশদানে ইতস্তত করেন। বরং দেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে এই প্রথা উচ্ছেদ করতে তাঁরা ইচ্ছুক ছিলেন। স্পষ্টতই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উচ্চবর্গের ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর নির্ভরশীল ছিল। কারণ তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এই গোষ্ঠীর মানুষই জনমত গঠন করতে সক্ষম ছিলেন । পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টও সতীপ্রথা একেবারে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে ইতস্তত করেন। তাঁর মত ছিল যে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে কালক্রমে এপ্রথা বিলুপ্ত হবে। অন্যদিকে বলপূর্বক প্রথাটি নিষিদ্ধ করলে দেশীয় জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।[২৪]

ওদিকে মিশনারীগণ প্রথাটির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে আসছিলেন। হিন্দুধর্মের নৃশংসতা প্রতিপাদন ও খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের প্রক্রিয়ায় মিশনারীগণ দেশীয় অধিবাসীদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ডাক্তার বুকাননের চেষ্টায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক কোলব্রুক ও কেরীর তত্ত্বাবধানে দশজন হিন্দু পণ্ডিত ছয়মাস বিভিন্ন

শ্মশানে সতীদাহে উদ্যত বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।[২৫] শ্রীরামপুর মিশনারীগণ ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সন্নিকটস্থ ত্রিশমাইল ব্যাসার্ধ অঞ্চলে ছয়মাসের মধ্যে তিনশতাধিক সতীর একটি হিসাব প্রস্তুত করেন। মিশনারী প্রদত্ত তথ্যে নিশ্চিত অতিরঞ্জন আছে। ক্লডিয়াস বুকানন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে সতী বিষয়ে শ্রীরামপুরে ছাপা একটি পুস্তিকা উইলবারফোর্সকে দেন। ১৮১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টে চার্টারবিষয়ক বিতর্কের সময় উইলবারফোর্স এটি ব্যবহার করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনে মিশনারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারি বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয় এবং তাঁরা পূর্ণোদ্যমে সতীবিরোধিতায় অবতীর্ণ হন।[২৬]

সৌভাগ্যবশত এই সময় জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চিন্তা ভাবনা ও সংস্কারচেতনা জাগরণের সূচনা দেখা দেয়। বস্তুত জনগণের ভিতর থেকে সংস্কারের চাহিদা না থাকলে উপর থেকে বলবৎ করে কোনো আইনই কার্যকর হতে পারে না। দেশীয় জনগণের মধ্যে সতীবিরোধী আন্দোলন শুরু করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রামমোহন রায়। হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত রামমোহন পাশ্চাত্ত্যের তৎকালীন ইউরোপীয় উদারপন্থী চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। মিশনারীদের সতীসম্পর্কিত কার্যাবলীর সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করে তিনি 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন এবং এই সভায় সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় বহু সমস্যা নিয়ে নিয়মিত তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত করেন। 'সতী' প্রশ্নটি সেখানে প্রায়ই আলোচনা হয় ও প্রথাটির নিষ্ঠুরতা বিষয়ে মত ব্যক্ত হয়। ক্রমে সতীদাহনিবারণী আন্দোলনের সঙ্গে রামমোহনের নাম এমনভাবে যুক্ত হয় যে প্রথাটির পক্ষে ও বিপক্ষে দুই দলের কাছেই তিনি সতীপ্রথা বিরোধিতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য হন।[২৭]

১৮১৩, ১৮১৫ এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সতী সম্বন্ধে আরোপিত সরকারি বিধিনিষেধগুলির বিরুদ্ধে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার রক্ষণশীল সমাজ সরকারের কাছে যে আবেদন করেন তার বিরুদ্ধে রামমোহন ও তাঁর বন্ধুবর্গ এক পাল্টা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এর কিছুদিন পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন প্রবর্তক ও নিবর্তকের আলোচনাসূত্রে সতীপ্রথার অমানবিকতা প্রতিপাদন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং সতীপ্রথা যেসব অঞ্চলে বহুলপ্রচলিত বিশেষত সেইসব অঞ্চলে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। নভেম্বর মাসে পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং ভূমিকাতে ইঙ্গিত দেন যে সতীপ্রথা হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে যেসব ইউরোপীয় কর্মচারী বিশ্বাস করেন, এখন আশা করা যায় তাঁরা মত পরিবর্তন করবেন। মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারদের উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করেন যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে সংযম ও শুচিতাপূর্ণ জীবনই বিধবার পক্ষে শ্রেয়তর।[২৮]

রামমোহনের পুস্তিকা কলকাতার হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে এবং ভীত রক্ষণশীল দল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরস্বরূপ ঘোষালবাগান চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশের সাহায্যে বিধায়কনিষেধক সংবাদ প্রকাশ করেন। তদুত্তরে রামমোহন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে সতীদাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের

ফেব্রুয়ারী মাসে পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদটি গভর্ণর জেনারেলপত্নী লেডী হেস্টিংসকে উৎসর্গ করেন। এই পুস্তিকায় সামগ্রিকভাবে স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উপর রামমোহন জোর দেন।[২৯] ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে তাঁর নিজস্ব পত্রিকা "সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিকার পাতায় তিনি সতীবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে দেশবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন শুরু করেন এবং সতীদাহ বিরোধী জনমত গড়ে তুলবার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রয়াসী হন।[৩০]

বিষয়টির অবশেষে নিষ্পত্তি হয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে। উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী বেন্টিঙ্ক এই অমানবিক প্রথা দমন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক বর্গও তাঁকে সতীপ্রথার আশু কিংবা ক্রমউচ্ছেদ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এছাড়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়-- ১৮২৫-এ ৬৩৯, ১৮২৬-এ ৫১৮, ১৮২৭-এ ৫১৭ এবং ১৮২৮-এ ৪৬৩ জন সতীর হিসাব পাওয়া যায়। লর্ড বেন্টিঙ্ক নিজে সতীপ্রথা উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তব অবস্থাও তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল ছিল। একদিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে সতীবিরোধী মনোভাব ব্যাপক আকার ধারণ করে অন্যদিকে ইতিপূর্বেই লর্ড হেস্টিংসের সময় ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রবল প্রতিপক্ষগুলির পতন ঘটে যায় (মারাঠাশক্তি চূর্ণ, পিণ্ডারী দমন, রাজপুতশক্তিগুলির ইংরেজের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ, নেপালযুদ্ধশেষে গোর্খাদের বন্ধুত্ব এবং গাড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলা লাভ)। ফলে ব্রিটিশশক্তি ভারতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ হয়। সুতরাং সতীপ্রথা উচ্ছেদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার আর কোনো কারণ ছিল না।

বস্তুত সমস্ত ঘটনাবলী বিচার করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে জনগণের আন্দোলনের চাপে সতী প্রথা উচ্ছেদ হয়নি। কারণ, চাপ সৃষ্টি করার মতো জনমত তখনো গড়ে ওঠেনি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জনমতের চাপে কোনো আইন প্রণয়ন করার মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাছাড়া সতীবিরোধী আন্দোলনের নায়ক রামমোহনও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রথা উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে লর্ড বেন্টিঙ্ক সৈন্যবাহিনী, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া জানবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সেই অনুসারে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেশ কিছু সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে গোপন বার্তা প্রেরণ করেন। প্রথাটি উচ্ছেদ করলে দেশীয় সৈন্যদলে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই এই মর্মে তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছয়। নিজামত আদালতের পাঁচজন বিচারপতিই এখন প্রথাটি উচ্ছেদের পক্ষে ছিলেন। উপরন্তু পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তাদ্বয়ও তাঁকে জানান সতীউচ্ছেদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই।[৩১]

অতঃপর বেন্টিঙ্ক বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং এসিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট

উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন এবং রামমোহন রায়ের মত গ্রহণ করেন। উইলসন সতীপ্রথাকে হিন্দুধর্মের অঙ্গ এবং এটি উচ্ছেদ করলে সরকারের এতাবৎ অনুসৃত "প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ না করা" নীতি পরিত্যাগ করা হবে বলে মনে করেন। এছাড়া আশঙ্কা করেন যে সতীবিরোধী আইন প্রণয়ন করলে প্রজাদের মনে সরকারের সব কার্যকলাপ সম্বন্ধেই সন্দেহের উদ্রেক হবে। রামমোহনও এব্যাপারে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করেন সতীপ্রথার বিধিনিষেধের উপর অধিকতর কঠোরতা আরোপ করে এবং পুলিশী তৎপরতার সাহায্যে পরোক্ষভাবে প্রথাটির দ্রুত অবসান ঘটান সম্ভব। সতী উচ্ছেদ করলে বরং প্রজাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে সরকারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজাদের বলপূর্বক স্বধর্মত্যাগ করে শাসকসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য করা।

উইলসন ও রামমোহনের মত বেন্টিঙ্কের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি অফিসারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সতীপ্রথার উচ্ছেদসাধন সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক কোনো পদক্ষেপ হবে না। তিনি এও লক্ষ্য করেন যে যেসব অঞ্চলে সতীপ্রথা সর্বাধিক প্রচলিত যেমন বাংলা, বিহার ও ওড়িশা সেখানকার জনগণ চিরদিন শান্তিপ্রিয়। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদাররা গ্রামাঞ্চলের শন্তিরক্ষায় নিযুক্ত এবং যেহেতু এই জমিদারশ্রেণী ব্রিটিশশক্তির উপর নির্ভরশীল তাই কোনরকম শান্তিবিঘ্নকারী ঘটনা তারা বরদাস্ত করবে না।[৩২]

সংগৃহীত সমস্ত তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে রচিত একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ নভেম্বর তাঁর কাউন্সিলের নিকট পেশ করেন এবং সতীপ্রথা উচ্ছেদের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ বেন্টিঙ্কের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। সুতরাং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর গভর্ণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের এক আইনবলে (Regulation XVII) সতীদাহ বেআইনী ও ফৌজদারি আদালতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। বেন্টিঙ্কের আইন বিলাতের কর্তৃপক্ষের পূর্ণসমর্থন লাভ করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যান উইলিয়াম অ্যাসটেল এবং বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট চার্লস্ গ্রান্ট তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।[৩৩]

কিন্তু রক্ষণশীল দলের মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" ও উক্ত দলের সংগঠন 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে এই বিধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে এবং এই বিধি প্রত্যাহারের জন্য কলকাতাবাসী ৮০০ জন বিশিষ্ট হিন্দুর স্বাক্ষরসম্বলিত এক আবেদনপত্র গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরিত হয়। গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্কের ইচ্ছাক্রমে গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, নীলমণি দে,ভবানীচরণ মিত্র প্রমুখ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি তাঁদের হাতে আবেদনের উত্তরটি অর্পণ করেন। তাতে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন যে সতীপ্রথা হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নয়, এই প্রথা উচ্ছেদের দ্বারা হিন্দুধর্মের উপর কোনো আক্রমণ করা হয়নি এবং সরকারের সেরকম

কোনো অভিসন্ধি আদৌ নেই। বিধবার পক্ষে সহমরণ অপেক্ষা কঠোর শুদ্ধাচারের জীবনকেই হিন্দুশাস্ত্রে পবিত্রতর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত বেন্টিঙ্কের যুক্তিগুলি সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর প্রদত্ত যুক্তিরই অনুরূপ। অবশ্য বেন্টিঙ্ক আবেদনকারীদের জানান যে তাঁরা যদি সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করতে চান তবে তিনি আনন্দের সঙ্গে তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন।[৩৪]

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি রামমোহন রায় কলকাতা টাউনহলে এক সভার মাধ্যমে বেন্টিঙ্ককে সতীদাহ নিবারণের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই অভিনন্দনে রামমোহন ছাড়াও দ্বারকানাথ ঠাকুর, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তিনশত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।[৩৫] বস্তুত রামমোহন প্রমুখ সংস্কারপন্থী হিন্দুরা প্রথমে সরকারি আইনের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু আইনটি পাস হওয়ার পর তাঁরা সর্ববিধ উপায়ে আইনটিকে সমর্থন করেন।

রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কলকাতার ডেপুটি শেরিফ ও অ্যাটর্নী ব্যারিস্টার ব্যাথিকে তাঁরা আবেদনপত্রসহ ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ব্যাথি ইংলণ্ডে আপীলের আবেদন পেশ করলে রামমোহন সতীদাহ নিবারণবিধির সমর্থনে এক পাল্টা আবেদন পার্লামেন্টে পেশ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে আপীলটি প্রিভি কাউন্সিলে ওঠে। দীর্ঘ শুনানীর পর প্রিভি কাউন্সিল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুলাই রক্ষণশীল দলের আবেদন নাকচ করেন। শুনানীর সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। রামমোহনের চেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিল ধর্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য করে। রামমোহনের সতীদাহবিরোধী আন্দোলন প্রধানত মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন হলেও এর ফলে সাধারণ জনগণ উপকৃত হন। কারণ বীভৎস সতীপ্রথা তখন সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের পরেই সতীদাহ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। মাঝে মাঝে দু একটি সতীর ঘটনা জানা গেলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা।[৩৬]

প্রিভি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত কলকাতায় পৌঁছনমাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দ্বিভাষিক পত্রিকা 'রিফর্মার'এর ইংরেজি সংস্করণের এক অতিরিক্ত সংখ্যা ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয় এবং এই আনন্দসংবাদ সাধারণে জ্ঞাপন করা হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর সভায় সভাপতিত্ব করেন। ধর্মসভার আবেদন নাকচ করার জন্য সম্রাট ও প্রিভি কাউন্সিলকে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অভিনন্দনপত্র প্রস্তুত করবার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়, কালীনাথ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সতীপ্রথা উচ্ছেদে রামমোহনের প্রচেষ্টার জন্য তাঁকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৩৭]

প্রিভি কাউন্সিলে 'ধর্মসভা'র আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুদের

মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দিলেও এবং জনগণের একটা বৃহৎ অংশের মনে ব্রিটিশ সরকারের ধর্মীয় নীতি বিষয়ে সন্দেহ জাগ্রত হলেও তা কখনো বিক্ষোভ বা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেনি। বস্তুত কলকাতার যে সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ বেন্টিঙ্কের আইন নাকচ করার চেষ্টা করেন তাঁরা সম্ভবত বিচলিত হন এই ভেবে যে এর সূত্র ধরে একের পর এক এমন সব বিধি দ্রুত গৃহীত হবে যার দ্বারা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি বিপন্ন হবে। এই আশঙ্কার প্রকৃত কোনো কারণ ছিল বলে মনে হয় না। কোম্পানীর শাসন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তারক্ষা বিষয়েই প্রাথমিক ভাবে আগ্রহী ছিল, সমাজ-সংস্কারে নয়। প্রজাদের ধর্ম ও প্রচলিত প্রথার উপর কোনো হস্তক্ষেপ যদি প্রজাদের ভিতর ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে তবে তাতে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা ছিল। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে কোম্পানী সরকার এবিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিল। সতী উচ্ছেদ আইনও জারি হয় অনেক সতর্ক বিচার বিবেচনার পরে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই আইন নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ। কিছুদিন পরেই সতীদাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই আইন বিধবা মেয়েদের জীবনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। বাঁচবার অধিকার যে-কোনো জীবিত মানুষের ন্যূনতম ও প্রথমতম মৌল অধিকার। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের দ্বারা এই মৌল অধিকার বিধিবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, হিন্দু বিধবা মেয়েরা এতকাল যে অধিকারের নিরাপত্তা পায়নি।

(খ)

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা বিধবা মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের আনন্দে বাঁচবার অধিকারকে স্বীকার করা হয়। আচারের কঠোর কৃচ্ছ্রতার দ্বারা নয়, সুস্থ উপভোগের দ্বারা জীবনকে সুন্দর করাই মানুষের কর্তব্য— এই তত্ত্বকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা গ্রহণ করে নেওয়া হয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে জড়িত হলেও, মনে রাখতে হবে যে সমস্যাটি তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেননি কিংবা আন্দোলনের শুরুও তাঁর হাতে হয়নি। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়দশক থেকে কিছু মানুষ বিধবাসমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করছিলেন এবং সমস্যা নিরাকরণের উপায় হিসাবে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব আলোচনা করছিলেন।

পূর্বেও বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গটি একবার পণ্ডিতমহলে উত্থাপিত হয়েছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ বালিকা বিধবাকন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হয়ে দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতগণের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান গ্রহণ করেন। কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও স্থানীয় অন্যান্য পণ্ডিতদের বিরোধিতায় রাজবল্লভ তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ হন।[৬৮] এদেশের সমাজে

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা অস্বাভাবিক ব্যাপকতা লাভ করে। এই কুপ্রথাগুলির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল সমাজে নারীর পক্ষে অকাল অথবা বাল্যবৈধব্য। পরিবারে বালবিধবা কন্যা বা ভগ্নীর উপস্থিতি অবশ্যই একটি গুরুতর পারিবারিক সংকট সৃষ্টি করত। সুতরাং রাজবল্লভের মতো হয়ত অনেক পিতার মনেই অষ্টাদশ শতকে বাল্যবৈধব্য প্রতিকারের আবশ্যকতাবোধ জাগ্রত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাঢ়ীয় কুলীন বন্দ্যবংশীয় ফুলিয়া মেলের ব্রাহ্মণ মথুরেশের একমাত্র পুত্র রাজারামের বিধবাবিবাহের কথা জানা যায়। এই বিরল ঘটনার উল্লেখ "কুলপঞ্জীতে" পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে সমাজ-সংস্কারকদের কাছে সমস্যাটির ভয়াবহতা বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং ক্রমে এবিষয়ে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। বস্তুত মানবিক ও সামাজিক উভয়বিধ কারণেই বিধবাসমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। সমস্যাটিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা যেতে পারে।

বিধবার জীবন যে দুঃখময়, বৈদিক নারীও তা উপলব্ধি করে প্রার্থনা জানায় "যেন ইন্দ্রানীর মতো অবিধবা হই"।[৩৯] কিন্তু তখন বিধবার বিবাহ আইনসঙ্গত ছিল, দেবর অথবা অন্য কোনো পুরুষকে পতিরূপে পুনরায় গ্রহণ করবার অধিকার তার ছিল। অনেক বিধবা বিবাহ করতেন, অনেকে ব্রহ্মচর্য পালন করতেন, কেউ কেউ সহমরণে যেতেন।[৪০] কিন্তু মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের শাসনে বিধবার পুনর্বিবাহ সমাজে ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে যায়। নারীর যৌনতার উপর পুরুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বস্থাপন এবং বিবাহবন্ধনকে চিরন্তন অচ্ছেদ্যতায় পরিণত করার অভিপ্রায়েই বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। প্রথমে বয়স্ক বিধবাদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলেও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই শিশুবিধবাগণও এর আওতাভুক্ত হয়।[৪১] অপরদিকে বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করে। নানাকারণে অপ্রাপ্তবয়স্কের মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি। সুতরাং একজন স্বামীর মৃত্যু ঘটলে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী বিধবা হতেন। অনেক সময়েই সেই স্ত্রীরা ছিলেন নিতান্ত শিশু, বালিকা বা তরুণী যুবতী। এমনকি বাগদানের পরে বরের মৃত্যু ঘটলে বিবাহ অনুষ্ঠান না হলেও বহু বালিকা কন্যা চিরবৈধব্য পালনে বাধ্য হত। বৈধব্যের আচারসমূহ ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং শিশু, বালিকা নির্বিশেষে সব বিধবার পক্ষে অবশ্যপালনীয়। মস্তক মুণ্ডন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান, সমস্ত অলঙ্কার বর্জন, ভূমিতে শয়ন, নিরামিষ এবং দিনে একবার মাত্র আহার, একাদশীর নির্জলা উপবাস, তাম্বুলগন্ধপুষ্পাদি ত্যাগ, অম্বুবাচী ব্রত পালন, ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের জীবন অতিবাহিত হত। উপরন্তু আজীবন ব্রহ্মচর্যপালনের কঠোরতার চাপ সহ্য করতে তাঁরা বাধ্য ছিলেন। বস্তুত ব্রহ্মচর্যভঙ্গের সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট করবার জন্যই উপরোক্ত কৃচ্ছ্রসাধনগুলির দ্বারা তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে বিধবার নীতিবিগর্হিত আচরণের প্রেরণাকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্ম বিধবার সমস্ত ভৌত অস্তিত্বকে এমন দুর্বল করবার চেষ্টা করেছিল যাতে সে ভ্রষ্ট হতে না পারে।[৪২] নারীর দৈহিক পবিত্রতারক্ষার এই প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবারস্থ পুরুষদের মর্যাদা বৃদ্ধি। পরিবারের একটি নারীর পদস্খলনে (ইচ্ছাকৃতে বা আকস্মিক) পুরুষ অভিভাবকদের সামাজিক সম্মানহানির কল্পনাও

অসম্মানজনক ছিল।

জীবনযাপনের এই কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়াও অন্য দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনও কম ছিল না। প্রচলিত প্রথানুসারে হিন্দু বিধবার স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না। অশনবসনের জন্য পরমুখাপেক্ষিতাবশত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় দাসীবৃত্তি করে বিধবার জীবন অতিবাহিত হত। সমাজে ও পারিবারে তাঁরা অমঙ্গলের প্রতীক বিবেচিত হতেন এবং কোনো শুভকাজে তাঁদের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত ছিল। মনে করা হত যে পূর্বজন্মের কোনো পাপের জন্য বর্তমান জন্মে বৈধব্য ঘটে থাকে। হযত পূর্বজন্মে স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গ বা স্বামীহত্যার ফল স্বরূপ এই জীবনে বৈধব্যরূপ শাস্তি বিধান হয়েছে । বস্তুত বিধবা পাপী। তবে পুত্রবতী বিধবার অবস্থা তুলনামূলকভাবে সহনীয় ছিল। কিন্তু কন্যার জননী বিধবার জীবন দুঃসহ ছিল। শিশুবিধবা ও সন্তানহীন তরুণীবিধবার জীবন সর্বাপেক্ষা অসহনীয়।[৪৩] বহুবিধ শারীরিক নির্যাতন, পাদুকাপ্রহার ইত্যাদির সংবাদও পাওয়া যায়। ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মিশনারীদের দশম বার্ষিক অধিবেশনে মিসেস ইথারিংটন জানান, "জীবন যাতে নামমাত্র সহনীয় হয় তার সুযোগও তারা কোনোদিন পায়নি।" তিনি আরো বলেন, "বিধবাদের আবার বাড়ি আছে নাকি?"[৪৪] এই অসহনীয় কারাগার থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় তাদের ছিল না। জীবনধারণের জন্য কোনো ভদ্র জীবিকা তাদের জানা ছিল না। কুলীনবিধবা নিস্তারিণীকে তাঁর দাদা জানান, "বিধবার আবার ব্যারাম কি?" বস্তুত সারাজীবন তিনি দাদা, ভাই, ভাইপোর সংসারে একাধারে দাসী, রাঁধুনী ও সন্তান পালকের কাজ করেন যদিও কাজ শেষে তাঁর আহারের কথা প্রায় কারো স্মরণ থাকে না।[৪৫]

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হলে বিধবার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় প্রতি পাঁচজন পুরুষের অনুপাতে একজন বিধবা (শিশুবিধবাসহ)।[৪৬] বিধবাবিবাহ আইন পাস, ব্রাহ্ম আন্দোলন ও ব্রাহ্ম বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পরেও যদি অবস্থা এত ভয়াবহ হয় তবে ত্রিশ চল্লিশের দশকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সামাজিক ও দৈহিক নিপীড়ন সত্ত্বেও যুবতী বিধবার দেহে মনে যৌবনের আহ্বান এসে পৌঁছাত। পরিবারের ভিতরে এবং বাইরে প্রলোভনের অভাব ছিল না। সুতরাং স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বহু বিধবা ভ্রষ্ট এবং গর্ভবতী হয়। বিধবার ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা কিংবা গর্ভপাতের চেষ্টায় গর্ভবতীর মৃত্যুর ঘটনা সেযুগে অজস্র ছিল। পারিবারিক সম্মানরক্ষার স্বার্থে সেগুলি গোপন করার চেষ্টা হলেও কখনো কখনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। গর্ভপাত সম্ভব না হলে গর্ভবতী বিধবা আত্মহত্যা করত অথবা পরিবারের ইজ্জত রক্ষার্থে বিধবাটিকে পিতামাতা বা অন্য কেউ হত্যা করত। এই অনুষ্ঠান "ঠাণ্ডা সতী" নামে পরিচিত ছিল। কোনো বিধবা সন্তানের জন্মদান করলে শিশুটিকে তৎক্ষণাৎ হত্যাকরা হত। এইসব পাপানুষ্ঠান গোপনতার আড়ালে সংঘটিত হলেও বহুদিনের আচরিত এই প্রথাগুলি সর্বজনবিদিত ছিল।[৪৭] হঠাৎ পদস্খলন ছাড়াও আর্থিক অসচ্ছলতা কিংবা অভিভাবকের অভাবেও অনেকবিধবা বিপথগামী হত। ভ্রষ্ট বিধবাগণ পরিবার পরিত্যক্ত অবস্থায় বেশ্যাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত। অসহনীয় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও

সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতেও অনেক বিধবা গৃহত্যাগ করত। তারাও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হত।[৪৮] ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদনে জানা যায় যে মোট ১২,৪১৯ জন বেশ্যার মধ্যে ১০,০০০ এরও বেশি হিন্দু। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার হেল্‌থ অফিসারের এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে ত্রিশ হাজারের অধিক মোট বেশ্যার অধিকাংশই হিন্দু। এই হিন্দু বেশ্যাদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ বিধবা। শিশুবিধবাদের প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন বিপথে যেতে বাধ্য হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি মামলার রায়দান প্রসঙ্গে মুন্সেফ চণ্ডীচরণ সেন (কবি কামিনী রায়ের পিতা ও স্বয়ং সাহিত্যিক) জানান হিন্দু বিধবাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন অসতী।[৪৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সমস্যাটির ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে যেসব সচেতন মানুষ সজাগ হচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায় প্রধান। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন স্থাপিত 'আত্মীয় সভা'র বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সঙ্গে বিধবাসমস্যা নিয়েও আলোচনা হত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে তারিখের এসিয়াটিক জার্নালে ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে উদ্ধৃত একটি বিবরণে এই সভার একটি অধিবেশনের উল্লেখ করে বলা হয়েছে এই সভায় বালবিধবাদের বৈধব্যের বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের ও সহমরণের তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বিবরণ দেখে কেউ কেউ মনে করেন রামমোহন বিধবাবিবাহের পক্ষে ছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females নামক গ্রন্থে তিনি হিন্দু বিধবাদের দুঃখময় জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরেন এবং তাদের জন্য ন্যায়বিচার দাবি করেন। উক্ত পুস্তকে রামমোহন প্রতিপাদন করেন যে বাংলাপ্রদেশে প্রচলিত দায়ভাগ রীতি অনুযায়ী স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার কোনো অধিকার না থাকাতে তাকে পুত্র ও পুত্রবধূর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয় এবং অনেক সময় অবজ্ঞা ও অবহেলায় জীবনযাপন করতে হয়। 'সংবাদ কৌমুদী'র ষষ্ঠ সংখ্যায় তিনি অসহায় বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য একটি অর্থ তহবিল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন।

রামমোহনের বিলাতযাত্রা ও সেখানে তাঁর মৃত্যুর পরে কিছুদিন পর্যন্ত মধ্যপন্থী সমাজ সংস্কারকদের কর্মোদ্যম স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ডিরোজিওশিষ্য র‍্যাডিক্যালপন্থী ইয়ংবেঙ্গল দলের অভ্যুত্থানে সমাজসংস্কারচিন্তায় এক ব্যাপক জোয়ার আসে। ডিরোজীয়ানরা সমাজের সমস্ত ত্রুটির প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন এবং এগুলির প্রতিকারের জন্য তীব্রকণ্ঠে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হিন্দুসমাজের যেসব কুপ্রথা ডিরোজিওর শিষ্য বর্গকে বিচলিত করে, বিধবার পুনর্বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তাদের অন্যতম। ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জানায় যে প্রায় তিনচার বছর আগে তাঁরা বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত একটি সভা গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন।[৫০] বস্তুত রামমোহনের আত্মীয়সভার আলোচনা ও সতীদাহ আন্দোলন এই দুইয়ের প্রভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থী এক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় শান্তিপুরনিবাসী এক অবিবাহিত

কুলীনকন্যা নিজ দুর্ভাগ্যের কথা জানান। সেই সঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন উচ্চবর্ণের পরিবারে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হয়েও অপ্রচলিত। তিনি আশা করেন যে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ইংরেজ সরকার আইন প্রণয়ন করবেন। একসপ্তাহ পরে উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় চুঁচুড়ানিবাসী কয়েকজন মহিলা তাঁদের 'পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের' উদ্দেশে প্রশ্ন করেন স্ত্রীর মৃত্যুর পরে স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারলে স্বামীর মৃত্যুরপরে স্ত্রীর কেন সেই অধিকার থাকবে না? তাঁরা আরো জানান সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন 'বিদ্যাধ্যয়নের' সুযোগ থাকে তাঁদের কেন তা নেই? তাঁরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তীব্র আপত্তি জানান। উপরন্তু স্বেচ্ছামত পতিনির্বাচনের এবং সমাজে মেয়েদের স্বাধীন গতিবিধির দাবিও জানান।[৫১]

বিধবাবিবাহের পক্ষে এইভাবে নানাদিকে কিছু কিছু দাবি উঠতে থাকে। বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় আইন কমিশন কলকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সদর আদালতের বিচারকদের কাছে বিধবাদের আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে মতামত জানতে চান। নীতিগতভাবে বালবিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করলেও সকলেই জানান আইনপ্রণয়ন করলে তা হিন্দুদের ভীষণভাবে আহত করবে। বিধবাবিবাহ বিষয়টি যেহেতু হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত তাই বিচারকরা এই বিষয়ে আইন প্রণয়নে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু দেশের লোকের ক্রমজাগ্রত চেতনায় বিধবার পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতা যে স্বীকৃতিলাভ করছিল তার পরোক্ষ স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিষয়টি নিয়ে আইন কমিশনের বিচার বিবেচনায়।[৫২] এই সূত্রে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গটি নিয়ে পত্র পত্রিকায় আলোচনা হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এক পাঠকের চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রপ্রেরক জানান হরকরা, কুরিয়ার, ইংলিশম্যান, রিফর্মার এবং সমাচারদর্পন পত্রিকার সম্পাদকগণ হিন্দুবিধবাদের দুরবস্থা নিবারণে উদগ্রীব। সুতরাং তিনি এইসব পত্রিকার সম্পাদকদের নিয়মিত আলোচনা প্রকাশ করতে এবং জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদকদের বিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলন শুরু করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু অন্যান্য পত্রপত্রিকা বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। জনমতও সাধারণভাবে বিধবার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে ছিল।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যগণ "সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ" বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' নামে একটি আলোচনাসভা গঠন করেন। এখানে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সঙ্গে বঙ্গনারীর জীবনের বিভিন্ন দুর্গতির কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সভায় মহেশচন্দ্র দেব "A sketch of the condition of the Hindoo women" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। হিন্দুনারীজীবনের নানা দুরবস্থার বর্ণনা ছাড়াও তিনি বিধবাপ্রসঙ্গে তীব্র মন্তব্য করেন। অজ্ঞান অবস্থায় শৈশবে হিন্দু মেয়ের বিবাহ হয়। পরে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তার বৈধব্য ঘটে তবে সে দায়ী নয় এবং ব্রহ্মচর্যের কঠোরতা তার উপর জোর করে চাপানো।

116358
29 APR 1997

অতএব বিধবার পুনর্বিবাহ যুক্তিযুক্ত।[৩]

"বেঙ্গল স্পেক্টেটর" পত্রিকা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে এই পত্রিকার নাম বিশেষভাবে যুক্ত। এই পত্রিকাকে ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র বলা যায়। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের সাহায্যে পত্রিকাটি প্রথমাবধি বিধবাবিবাহকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানায়। বেঙ্গল স্পেক্টেটরের প্রথম সংখ্যায় জনৈক ব্যক্তির দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়, উক্ত পত্রে নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খলিখিত, হারীত প্রভৃতি স্মৃতিকারের রচনা বিচার করে দেখানো হয় যে বিধবার পুনর্বিবাহ শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়, শাস্ত্রসম্মতও। আরো বলা হয় যে পূর্ববর্তী কয়েকবছর ধরে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা গেছে হিন্দু সমাজে এ সম্বন্ধে প্রবল বিরোধিতা নেই। "সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়রা" উদ্যোগী হয়ে....."সাহস ও ঐক্যমতপূর্বক ক্রমাগত উক্ত বিষয়ে চেষ্টা করিলে পরিশ্রম নিষ্ফল হইবেকনা।"[৫৪]

বেঙ্গল স্পেক্টেটরের পত্রটি বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করে এই সম্বন্ধে আলোচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এতদিন পর্যন্ত ইয়ং বেঙ্গলদের আলোচনায় বিধবাদের দুরবস্থা ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে মানবিক ও যুক্তিবাদী মতসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সকলের ধারণা ছিল বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরোধী। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করে পত্রলেখক দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির বিরূপতা অপনোদন করতে অগ্রসর হয়েছেন।

এই নতুন যুক্তিপ্রয়োগে রক্ষণশীল সমাজে উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং সংবাদ প্রভাকরে একটি প্রতিবাদ মুদ্রিত হয়। পত্রে বলা হয় "বিধবার পুনর্বিবাহ হইলে সম্প্রদানকর্তা কোন ব্যক্তি হইবেক? প্রথম বিবাহকালীন দান দ্বারা ঐ স্ত্রীতে তাহার পিতা ও মাতার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে"। বেঙ্গল স্পেক্টেটর এর উত্তরে পঞ্চম সংখ্যায় শাস্ত্রীয় মীমাংসা দান করে এবং রাজা রাজবল্লভের ঘটনার উল্লেখ করে। পরাশরের বিখ্যাত শ্লোক "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে--------" এই প্রথম বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যবহৃত হয়। শ্লোকটির বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে এই রচনটিতে বিধবাবিবাহের পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। বস্তুত স্পেকেটটরে প্রকাশিত যুক্তির সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রায় তের চোদ্দবছর পরে বিদ্যাসাগর প্রচারিত যুক্তির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। স্পেক্টেটরে যখন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় রচনাদি প্রকাশ হচ্ছে তখন বিদ্যাসাগর সবেমাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। বাইশ বছর বয়স্ক এই তরুণ যুবকের হয়ত স্পেক্টেটরে প্রকাশিত যুক্তিগুলি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। অবশ্য স্পেক্টেটরে প্রকাশিত যুক্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যুক্তির সাদৃশ্য থাকলেও একটি বিষয়ে বড় পার্থক্য ছিল। তাঁরা এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন বা সরকারিহস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত মনে করতেন। "তাহা হইলে আমাদিগের ধর্মাধর্ম বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে তাহাও এই দৃষ্টান্তবলে গবর্নমেন্ট কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক"।[৫৫] স্পেক্টেটর তথা ইয়ং বেঙ্গলগণ মনে করতেন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটলে এবং যুবকগণ 'কর্তব্যকর্মে সাহসী' হয়ে বিধবা বিবাহ করতে উদ্যোগী হলে এই সমস্যার সমাধান হবে।

ইতিপূর্বে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মতিলাল শীল ভ্রূণহত্যা নিবারণকল্পে অন্তঃসত্ত্বা বিধবাদের জন্য প্রসূতিসদন ও নবজাত শিশুদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের উদ্দেশ্যে ডাক্তার ও'সাগুনসির মাধ্যমে সরকারের কাছে একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল শীল ঘোষণা করেন কোনো হিন্দু ভদ্রলোক কোনো বিধবাকে বিবাহ করলে তিনি সেই ব্যক্তিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দান করবেন।[৫৬]

বাবু শ্যামচরণ দাস তাঁর বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হয়ে পণ্ডিতদের কাছে জানতে চান যে তাঁর কন্যার স্বামীর সঙ্গে পরিচয়ও হয়নি। তিনি শূদ্র। তাঁর কন্যার বিবাহদান শাস্ত্রমতে সম্ভব কিনা। প্রশ্নটি নিয়ে রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা ও তুমুল বিতর্ক হয়। পণ্ডিতগণ রায় দেন যে অক্ষতযোনী শূদ্রবিধবাকন্যার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু পরে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।[৫৭]

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বিধবাবিবাহ সমর্থনে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থালাভের জন্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি বিধবাবিবাহের অনুকূলে একটি উদার ব্যবস্থাপত্র দেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি 'ধর্মসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মতামত জানবার জন্য যোগাযোগ করে। শেষোক্ত সংগঠনটি কোনো উত্তর দেয়নি, কিন্তু ধর্মসভা এ ব্যাপারে কিছুকাল মতবিনিময় করে। এর পরে বিধবাবিবাহ যে সম্পূর্ণ অবৈধ এবিষয়ে ধর্মসভা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বৌবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন যুবক বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ব্যর্থ হন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদক) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জানান যে রামমোহনের সমসময়ে তিনি কলকাতা নগরীতে আগমন করেছেন এবং তখন থেকে সতীদাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াসী হয়েছেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ঠনঠনিয়ায় রামচন্দ্র দত্তের গৃহে কয়েকজন যুবক 'সর্বশুভকরী সভা' নামে একটি সভা গঠন করেন এবং ঐ বছর আগষ্ট মাস থেকে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। এই সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ' বিধির প্রতিকূলতা করা ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। সর্বশুভকরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটি।[৫৮] বাল্যবিবাহের দোষসমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর কুফলস্বরূপ বালবিধবার প্রাচুর্যের উল্লেখ করে তাদের জীবনের দুঃখ, ক্লেশ ইত্যাদির মর্মান্তিক বিবরণ দেন। সুতরাং বলা যায় সর্বশুভকরী পত্রিকার মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবাবিবাহ আন্দোলনে উদ্যোগী হন।

১৮৫০ বা ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহের

বৈধতা প্রমাণে পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ নব্যপন্থীগণ তাঁকে একার্যে সহায়তা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হননি।[৫৯] ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ডিরোজিও শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একাধারে বিধবা, সিভিল ও অসবর্ণ বিবাহ করেন। চাঞ্চল্যকর এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে।[৬০] ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত একটি বিধবাবিবাহের সংবাদ পরিবেশনের সূত্রে 'সংবাদ প্রভাকর' ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। বস্তুত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবাবিবাহের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং "সংবাদ প্রভাকারে" প্রকাশিত রচনায় সেই মনোভাব প্রতিফলিত হয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা পূর্বে বিধবার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্যপালনকে শ্রেয় মনে করলেও পরে বিধবাবিবাহের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্রের গৃহে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদসমিতি' নামে এক সভা গঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সভার সভাপতি এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। সভার সভ্যগণ ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি। এই সভার মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রলাল, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তিগণের সংযোগ একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিধবাবিবাহ প্রচলন। সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রস্তাব করেন যে এবিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার কাছে আবেদন করা হোক। এই প্রস্তাব সভায় অনুমোদিত হয়।[৬১]

এইভাবে দীর্ঘ প্রায় দুই তিন দশক ধরে বিধবাসমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনার প্রয়াস চলে। ইয়ং বেঙ্গল দল ও অন্যান্য সমাজসচেতন ব্যক্তির চেষ্টায় সমগ্র বিষয়টি ক্রমে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এইসব বিশৃঙ্খল প্রচেষ্টাকে একটি রীতিমতো আন্দোলনের রূপ দান করবার জন্য প্রয়োজন ছিল অসাধারণ কর্মতৎপরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে অতঃপর বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টা একটি সমাজ-বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" মাধ্যমে এই আন্দোলন প্রথমে সংগঠিত হয়।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "তত্ত্ববোধিনী সভা" স্থাপন করেন। ধর্মসংস্কারছাড়া সমাজ সংস্কারও এই সভার আনুষঙ্গিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। এই সভায় রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজীয়ানরা যেমন ছিলেন, তেমনি অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরাও ছিলেন। এই সভার মুখপত্ররূপে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হতে থাকে। এই মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্বগ্রহণ করেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রস্তাব ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে (ফাল্গুন, ১৭৭৬ শকাব্দ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। বহু ধর্মশাস্ত্র মন্থন করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেন যে কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র পরাশরসংহিতা এবং এই সংহিতার ''নষ্টে মৃতে'' ইত্যাদি শ্লোক অনুসারে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। পরাশরবিধি অনুযায়ী স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব হলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রস্তাবটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। দেশের গোঁড়া পণ্ডিতগণ তীব্র প্রতিবাদ করে মত প্রকাশ করতে থাকেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (চৈত্র ১৭৭৬ শক) সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ''নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিপথ আশ্রয়'' করে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। প্রথমত, স্ত্রীবিয়োগের পর পুরুষের পুনরায় দারপরিগ্রহ যেহেতু পাপ নয় তাই স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার পুনর্বার পতি গ্রহণও পাপ হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এদেশের নারী সর্ববিষয়ে এবং আর্থিক বিষয়ে স্বামীর উপর নির্ভরশীল বলে স্বামীর মৃত্যুর পরে তার অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে পরিবারের লোকেরা তার সঙ্গে দাসীবৎ আচরণ করে। তৃতীয়ত, একজনের বৈধব্য বহুজনের যন্ত্রণার হেতু। চতুর্থত, বালবিধবার পক্ষে স্বাভাবিক রিপুদমন প্রায়ই সম্ভব হয় না। পঞ্চমত, এর অনিবার্য ফল ভ্রূণ হত্যা। ষষ্ঠত, কৌলীন্যপ্রথার দরুণ বিধবার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সপ্তমত, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় মৃতদার পুরুষেরা উপযুক্ত বয়সের কন্যা গ্রহণ না করে অল্পবয়স্ক বালিকা কন্যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করছেন। প্রাচীন পতির পক্ষে তরুণী ভার্যার প্রেমাস্পদ হওয়া সহজ নয় এবং হয়ত তাঁর যখন মৃত্যু হয় স্ত্রী তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। অষ্টমত, সহমরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় বৈধব্যজনিত যন্ত্রণা সহ্য করতে বিধবারা বাধ্য হচ্ছে। নবমত, কেউ কেউ প্রচার করছেন যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে মেয়েরা সধবা অবস্থায় স্বামীহন্তা হবে এবং ইচ্ছামতো পরে বিবাহ করবে। কিন্তু বহুপত্নী গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুরুষ যদি স্ত্রীহন্তা না হয় তবে স্ত্রীজাতিও পতিহন্তা হবে না।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীগণ বিদ্যাসাগরের যুক্তিসমূহের অবৈধতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এই প্রতিবাদ খন্ডন করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে তাঁর ''দ্বিতীয় পুস্তক'' প্রকাশ করেন। উপযুক্ত শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগ করে বিদ্যাসাগর পুনরায় স্বীয় মতের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। দ্বিতীয় পুস্তিকাটির উপক্রম ও উপসংহারভাগ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়। কিন্তু শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যা শাস্ত্রোজ্ঞ পণ্ডিতদের জন্য। সাধারণ দেশবাসীর কাছে বিদ্যাসাগর বিধাবাদের পক্ষে কাতর আবেদন জানান, ''যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই..... আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।''[৬২]

অতঃপর বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবাবিবাহ প্রস্তাবকে সমর্থন ও বিরোধিতা করে বহু আবেদনপত্র সরকারের কাছে প্রেরিত হয়, বিপক্ষের আবেদনপত্রই সংখ্যায় বেশি ছিল।

এদিকে বিধবাবিবাহ আইন যাতে পাস হতে না পারে সেজন্য রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত এক প্রতিবাদপত্র সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। এছাড়া নদীয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া ও বাঁশবেড়িয়ার পণ্ডিতদের কাছ থেকেও বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন পৌঁছায়। বিরোধীপক্ষের প্রধান যুক্তি ছিল যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র ও দেশাচারবিরুদ্ধ। তাছাড়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদের ফলে বংশলোপের সম্ভাবনা ও পারিবারিক বিপর্যয় ঘটবে।[৬৩]

কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রেরিত প্রায় একহাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরসম্বলিত আবেদনপত্রটি ছাড়াও আরো বহু স্বতন্ত্র আবেদনপত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধাকান্ত সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গল দল প্রস্তাবিত আইনকে সমর্থন করে একটি সংশোধনী প্রস্তাব দেন। তাঁরা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। পাত্র পাত্রী যতদিন পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন ততদিন এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপাত্ররা প্রায় ৩৭৫ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ এই সংশোধনী প্রস্তাব সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। তাছাড়াও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি কৈলাস দত্ত সহ ৪৪ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। তাঁরাও অনুরোধ করেন যে রেজিস্ট্রি না করা হলে কোনো বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হবে না এই মর্মে একটি ধারা যেন প্রস্তাবিত আইনে যুক্ত হয়।[৬৪]

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর আইন পরিষদের সদস্য গ্র্যান্ট সাহেব বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের খসড়াটি আইন পরিষদে পেশ করলে কিছু কিছু উচ্চপদস্থ ইংরেজ বিলটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বহু তর্কবিতর্ক আবেদন নিবেদন ইত্যাদির পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। ঐ বছরই ৭ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে প্রথম আইনসিদ্ধ বিধবাবিবাহ হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা 'পরমাহ্লাদের' সঙ্গে এই সংবাদটি পরিবেশন করে। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন, সংস্কৃত কলেজের কৃতীছাত্র, প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং পরে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত। শ্রীশচন্দ্র দেশবিখ্যাত কথক খাঁটুরানিবাসী রামধন তর্কবাগীশের পুত্র। কন্যা কালীমতির পূর্ববিবাহ হয় চার বছর বয়সে এবং ছয় বছরে বৈধব্য ঘটে। কালীমতির পিতা বর্ধমানের পলাশডাঙ্গানিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় জীবিত না থাকায় মাতা লক্ষীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কন্যার বিবাহ দেন। বিবাহের ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর বহন করেন ও সেসময়ের বহু গুণী, পণ্ডিত, তর্করত্ন, ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন উপাধিধারী ব্যক্তি মান্য অতিথিরূপে বিবাহ আসরে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন পানিহাটির প্রসিদ্ধ কুলীন বাবু হরকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতার নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র বাবু

ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশবর্ষীয় বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ হয় রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে তাঁর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দুর্গানারায়ণ বসু ও ভ্রাতা মদনমোহন বসুর। এই বিবাহ ব্যাপারে রাজনারায়ণ তাঁর পরিজন কর্তৃক উৎপীড়িত হন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার তাঁকে সমর্থন করেন।[৬৫]

প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের নামে বহু নিন্দা ওকুৎসা রটনা আরম্ভ হয়। তাছাড়া তাঁকে হত্যার চক্রান্তও করা হয়। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পাশে সহযোদ্ধার মতো সর্বদা দণ্ডায়মান থাকেন 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য সমাজসংস্কার-বাল্যবিবাহনিবারণ আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তিনি সমান বলিষ্ঠতার সঙ্গে লেখনীচালনা করেন। তাঁর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি প্রতিপক্ষের কঠোর সমালোচনা করে. নিয়মিত সমুচিত প্রত্যুত্তর দেন এবং বিদ্যাসাগরের কুৎসার বিরুদ্ধে এমন সব ঘটনা ও সংবাদ পরিবেশন করেন যা অন্য কোনো সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৬৬] বিদ্যাসাগর, গৌরীশঙ্কর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই তিনজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে সমাজসংস্কার আন্দোলনে যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন তা পূর্বতন দুই দশকের ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনকে অতিক্রম করে যায়।

বিধবাবিবাহের সমর্থক, উদ্যোক্তা ও বিবাহকারী সকলকেই যথেষ্ট সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ষাটটি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। এই সব বিবাহের ব্যয় বাবদ বিরাশি হাজার টাকার দায়িত্ব তিনিই বহন করেন। এর জন্য তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ হয়। বন্ধুদের ঋণশোধের তাগিদে তিনি বিব্রত হয়ে ওঠেন । বহু ব্যক্তি তাঁকে বিধবাবিবাহ কার্যে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও অনেকের পক্ষেই তা শুধু সাময়িকভাবে ও সামান্য পরিমাণে পালন করা সম্ভব হয়। অনেক বন্ধু আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় তাঁকে পরিত্যাগ করেন। তাঁর ঋণের কথা জানতে পেরে হিন্দু পেট্রিয়ট ও এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকবৃন্দ এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ করতে উদ্যত হন। এই রকম দান গ্রহণে অসম্মত হয়ে বিদ্যাসাগর জানান যে কেউ যদি বিধবাবিবাহের সাহায্যার্থে এক পয়সাও দান করতে চান তবে তা সাদরে গৃহীত হবে। কিন্তু তাঁকে বিপন্ন ভেবে সাহায্যের জন্য কেউ যেন অর্থসংগ্রহ না করেন। নিজের দায়ভার অন্যের সাহায্যে মুক্ত হতে তিনি ইচ্ছা করেন না।[৬৭] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহের সঙ্কল্প করলে বিদ্যাসাগর আনন্দিত হন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়।

সাধারণ মানুষের উপর বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে অজস্র ছড়া ও গান রচিত হয়। বিদ্যাসাগব যখন পদব্রজে পথে গমনাগমন কবতেন তখন অনেক স্ত্রীলোক একদৃষ্টিতে তাঁকে

অবলোকন করতেন। সাধারণ কৃষক মাঝি কামার তাঁতি এই সংস্কার আন্দোলনের মানবিক আবেদনে সাড়া দেয় স্বতোৎসারিত লোকসাহিত্যের মাধ্যমে। শান্তিপুর তাঁতিদের বিদ্যাসাগর পাড়সমন্বিত কাপড় বয়ন এবং 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' গান রচনা ঐ সময়ের জনসানসের অনুভূতির প্রতীক বলা যায়।[৮৮]

কিন্তু যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করতে বিদ্যাসাগর প্রায় সর্বস্ব পণ করেন, সেক্ষেত্রে মানুষের লোভ ও অসততা এবং আইনগত ত্রুটির জন্য তিনি বহুক্ষেত্রে প্রতারিত হন। বহু প্রবঞ্চক একাধিক বিবাহকারী শুধু লোভের বশে বিধবাবিবাহ করে এবং বহুবিবাহনিরোধক আইনের অভাবে বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রবঞ্চনা বন্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত পাত্রকে দিয়ে একখানি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতেন। পাত্রীকে সম্বোধন করে এই চুক্তিপত্র লিখিত হত। একটাকার স্ট্যাম্প কাগজে এটি লেখা হত এবং তাতে চারজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকত।

দ্বিতীয়ত বিধবাবিবাহ আইনে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ছিল। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী যখন বিধবাবিবাহের সঙ্গে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন পাস করিয়ে একবিবাহ ও স্বামী স্ত্রীর ব্যক্তিগত বন্ধন দৃঢ় করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং আইনটি বিধবাদের পুনর্বিবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে যে কোনো স্বাধীন পুরুষ নারীর বিবাহের আইনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর এবিষয়ে কোনো মত দেননি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের উদ্‌যোগে যখন Civil Marraige Act বা তিন আইন পাস হয় তখন বিদ্যাসাগর খুব আনন্দিত হন। ইতিমধ্যে বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা এড়াতে তিনি যে চুক্তিপত্রের ব্যবস্থা করেন তার সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের পূর্বপ্রস্তাব বা পরবর্তীকালের তিন আইনের ভাবগত বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। এমনকি স্বামীর আচরণে অসন্তুষ্ট হলে বিবাহিত স্ত্রী স্থানান্তরে থাকতে পারবে, তাঁর রচিত চুক্তিপত্রের এই শর্তের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে দেখা যায়। তিন আইনকে সংশোধন করে হিন্দু বিধবাবিবাহকে তার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।[৮৯]

তৃতীয়ত অ-পুনর্বিবাহিত বিধবাদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈধব্য আচারপালনের প্রশ্নটি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। সহমরণ নিবারণের সময় নিষ্ঠাব্রতী বৈধব্যের সপক্ষে রামমোহন যে যুক্তি প্রদর্শন করেন (পতির সঙ্গে স্বর্গে পুনর্মিলনের জন্য যদি সহমরণ হয় তবে তা হল সকাম কর্ম। কিন্তু বেঁচে থেকে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্যপালন হল নিস্কাম কর্ম) সম্ভবত সেজন্য এবিষয়ে কোনো আন্দোলন করার অসুবিধা বিদ্যাসাগর অনুভব করে থাকবেন। অর্থাৎ সতীদাহ প্রশ্নটি বিবেচনার ক্ষেত্রে রামমোহন বিধবাসমস্যার নিষ্ঠুরতাকে তাত্ত্বিক সমগ্রতায় গ্রহণ করেননি। বিদ্যাসাগরও তাঁর আন্দোলন শুধু বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[৯০]

বিদ্যাসাগরের এত চেষ্টা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ লোকপ্রচলিত হয়নি। বরং কার্যত আইনটি প্রায় অপ্রচলিত হয়ে যায়। এমনকি পাশ্চাত্যশিক্ষিতের মধ্যেও এই আইনের

সাফল্য নৈরাশ্যজনক। পুরাতন দেশাচারের সংস্কার মানুষের মনে এমন দৃঢ়মূল ছিল যে এই আইন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কেউ যদি সৎসাহস অবলম্বন করে কোনো বিধবাকে বিবাহ করত তবে সমাজ এবং বন্ধু সকলেই তাকে পরিত্যাগ করত। এই ভয়ানক সামাজিক নির্যাতন সহ্য করবার শক্তি কম মানুষের কাছেই আশা করা যায়।[৭১]

বিধবা সমস্যাটি যে কত গভীর ছিল ও অধিকাংশ বিধবা যে আইনের ফল ভোগ করতে পারেননি তা অনেক পরবর্তী একটি পরিসংখ্যানেও জানা যায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী বঙ্গদেশে প্রতি চারজন হিন্দুনারীর মধ্যে একজন বিধবা অথচ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতি ছয়জন নারীর মধ্যে একজন স্বামীহীন। বিবাহযোগ্য বয়সের (১৫ থেকে ৪০) স্বামীহীন নারীর পুনর্বিবাহ মুসলমান সমাজে সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা বলেই, সেই সমাজে বিধবার সংখ্যা হিন্দু বিধবার তুলনায় প্রায় অর্ধেক।[৭২] অবশ্য বিধবাবিবাহ প্রবর্তনেই সমাজে নারীর মর্যাদা সরাসরি প্রতিষ্ঠিত হয়না। মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহের যথেষ্ট প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সেখানে নারীর স্থান এতটুকু উন্নত ছিল না। যদিও ইসলামে বিধবাবিবাহ আইনসম্মত কিন্তু বাস্তবে বালবিধবাদের উপর সামাজিক নিগ্রহ প্রচলিত ছিল। বিধবাবিবাহের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। যশোহরের সহিত্যিক মোহম্মদ মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭) মুসলিম সমাজের মেয়েদের এইসব দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য লেখনী চালনা করেন, বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেন ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৭৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ব্রাহ্মগণ এবং নারী উন্নয়নের কয়েকটি বিষয় যথা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহবিরোধী এবং বিধবাবিবাহসম্বন্ধীয় ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও অবরোধ বিলোপ সংক্রান্ত কার্যক্রম বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। প্রথম ব্রাহ্ম বিধবাবিবাহ করেন গুরুচরণ মহলানাবিশ, কন্যা রুক্মিনী দেবী। দ্বিতীয় ব্রাহ্মবিধবাবিবাহ করেন পার্বতীচরণ দাস, এটি প্রথম ব্রাহ্ম অসবর্ণবিধবাবিবাহও বটে, (কন্যা ব্রাহ্মণ)। তৃতীয় ব্রাহ্মবিধবাবিবাহ করেন চণ্ডীচরণ সিংহ, চতুর্থ অঘোরনাথ গুপ্ত। এর পরে অগণিত বিধবাবিবাহ ব্রাহ্ম পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়।[৭৪]

কিন্তু ব্রাহ্মগণ সমাজের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, ভদ্রলোক, শহরবাসী ও এলিটশ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মগোষ্ঠীর বাইরের বৃহৎ আপামর জন সমাজে বিধবার সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকেও দেখা যায় দুর্ভিক্ষের মতো প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের প্রথম বলি বিধবারা। একটি ঘটনায় জানা যায় ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় (তখন ওড়িশা ও বিহার বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল) কয়েকটি বিধবা মেয়ের পিতা অথবা ভ্রাতা কটকে হাকিমের গৃহে মেয়েদের জন্মের মতো রেখে যায় এবং সেই বিধবাগণ আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত অবস্থায়, কেউ কেউ শিশুসন্তানসহ, পূর্ববঙ্গের গ্রামে হাকিমের দেশের বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে বাস করতে থাকে।[৭৫] বিংশ শতকের তৃতীয় দশকেও দেখা যায় পদস্থ ঘরের বিধবা মহিলা সারা সকাল পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নান ও

মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করে ফেরেন। তাঁর এই বাতিকে সম্মানহানি হয় পরিবারে এবং তাঁরা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য গ্রহণ করেন। মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেন, ''ক্ষতি হচ্ছে কি কারো? জীবনের চাপ উনি নিজের মতো করে মানিয়ে নিচ্ছেন।''[৭৬] অর্থাৎ নিম্নবিত্ত সাধারণ ঘরে যেমন,উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত ঘরেও তেমনি বিধবার জন্য বরাদ্দ আছে 'জীবনের চাপ'। এই চাপ থেকে অব্যাহতি পেতে কেউ ধর্মকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন আর কেউ বা চাপের কারণেই পরিবার পরিত্যক্ত হন।

(গ)

কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহ উচ্ছেদ প্রয়াস

কুলীনপ্রথা ও বহুবিবাহ অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ জীবনের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। সমস্যাটির উৎপত্তি ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থেকে।

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্য গৌরব রক্ষার জন্য কৌলীন্যমর্যাদা স্থাপন করেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান— কৌলীন্যের এই নয়টি গুণ স্থির হয়। ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতে আটঘরের উনিশজন ব্রাহ্মণ উচ্চ কুলীনের মর্যাদা লাভ করেন। এর পরের স্তরে যাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হয় তাঁরা শ্রোত্রিয়, তৃতীয় বংশজ এবং সর্বনিম্ন ধাপে গৌণ কুলীন। স্থির হয় কুলীনরা শুধু কুলীন পরিবারেই বিবাহ করবেন। কুলীনদের পক্ষে শ্রোত্রিয় কন্যাগ্রহণ অনুমোদিত হলেও শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান নিষিদ্ধ হয়। গৌণকুলীনকে কন্যাদান ও গৌণকুলীনের কন্যাগ্রহণ কুলীনের পক্ষে কুলনাশক বলে গণ্য হয় এবং এই রীতি ভঙ্গ করলে কুলীন বংশজে পরিণত হন। বংশজের কন্যা গ্রহণ করলেও কুলীনের কুলহ্রাস হয় ও বংশজে পরিণত হন। এইভাবে বিবাহ সম্বন্ধকে সীমাবদ্ধ করা হয়। কালক্রমে কুলীন ব্রাহ্মণদের নয়টি গুণের প্রায় সবগুলিই লোপ পায়। প্রায় দশপুরুষ পরে বিখ্যাত দেবীবর ঘটক কুলীন ব্রহ্মণদের পৃথক পৃথক দোষ অনুসারে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম 'মেল'। দোষ অনুসারে কুলীন ব্রাহ্মণরা ছত্রিশটি 'মেল'-এ বিভক্ত হন। দেবীবর বিধান দেন যে বিবাহ সম্পর্ক কেবল নির্দিষ্ট 'মেলে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।[৭৭]

মেলবন্ধনের পূর্বে কুলীনদের আটঘরে পরস্পর বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই ''সর্বদ্বারী বিবাহ'' ব্যবস্থায় এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করবার প্রয়োজন হত না এবং কোনো কুলীন কন্যাকেই যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকতে হত না। কিন্তু মেলবন্ধনের পরে বিবাহসম্বন্ধকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে কুলরক্ষার জন্য পাত্রের অনটন ঘটে এবং এক পাত্রে অনেক কন্যাদান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এইভাবে দেবীবর প্রবর্তিত মেলবদ্ধ কৌলীন্যপ্রথা থেকে বঙ্গদেশে বহুবিবাহের সূত্রপাত হয়। বিশেষত নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণপাত্রে কন্যাদান একেবারে নিষিদ্ধ হওয়ায় নির্দিষ্ট কুল মেল

গোত্রের পাত্র বিবাহিত হলেও পিতা তাকেই কন্যাদান করতে বাধ্য হতেন।

কুলীন ব্যক্তিরা সমাজে যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন তা থেকে অন্য ব্রাহ্মণরা বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কুলীনপাত্রের সঙ্গে কন্যা বা ভগ্নীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হলে কন্যাপক্ষীয়দের কুলমর্যাদা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাবার আশা থাকে। অথচ সমান বা উৎকৃষ্ট ঘরে বিবাহ করা কুলীনের পক্ষে বিধেয় ছিল বলে শ্রোত্রিয়, বংশজ বা গৌণকুলীনরা কন্যা বা ভগ্নীর বিবাহের জন্য কুলীনপাত্রকে অর্থ প্রলোভনে বশীভূত করার চেষ্টা করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হতেন। বহু কুলীনপাত্র জাগতিক লাভের জন্য বংশমর্যাদা ত্যাগ করে অকুলীন কন্যা গ্রহণ করতে থাকেন। এই ভাবেও বহুবিবাহ বৃদ্ধি পায় এবং কুলীনের বিবাহবন্ধন ব্যবসায়ে পরিণত হয়।

অপরদিকে অষ্টাদশ শতক থেকে কৌলীন্য প্রথাজনিত বহুবিবাহের ব্যাপক প্রসারের অন্যতম মুখ্য কারণ ছিল ব্রাহ্মণসমাজের অর্থনৈতিক দুর্গতি। এদেশের সমাজের কাঠামো শ্রেণীগঠনের উপর ভিত্তিশীল এবং মধ্যযুগেই তা গতিশীলতা হারিয়ে অনড় অটল হয়ে যায়। সমাজিক শ্রেণীভেদের এই অপরিবর্তনীয় কাঠামো ছিল স্তরিত পিরামিডের আকারে। ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই পিরামিডের শীর্ষে। অথচ সামাজিক উৎপাদনক্রিয়া বা সম্পদসৃষ্টির সঙ্গে এই শ্রেণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এই শ্রেণী পরাশ্রিত হয়ে পড়ে। এদিকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা চলতে থাকে। মুঘল সার্বভৌমত্বের ও নবাবী কর্তৃত্বের ক্রমিক অবক্ষয় এবং ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন পরীক্ষা ও পরিবর্তন স্বভাবতই সমাজ-জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[৭৮] ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের ফলে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন ও ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ছাড়াও পরবর্তীকালের পাঁচবছর বা একবছরের ইজারাদারি ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত দেশের অভ্যন্তরে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক অনাচারের সৃষ্টি করে।[৭৯] নির্বিঘ্ন জ্ঞানচর্চা ও ধর্মপালনের জন্য ব্রাহ্মণগণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পুরাতন অভিজাত ও জমিদারশ্রেণী যাঁদের অধিকাংশই পাঁচবছর, একবছর বা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমির উপর স্বত্বাধিকার হারান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহু 'লাখেরাজ' সম্পত্তিকেও নাকচ করে এবং দান স্বরূপ প্রাপ্ত এই নিষ্কর ভূ-সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল বহু ব্রাহ্মণ পরিবার ধ্বংসোন্মুখ হয়।[৮০]

পরাশ্রিত এবং উৎপাদন বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণ সমাজ এই অর্থনৈতিক ভাঙাগড়ার চাপে চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়। ভিক্ষাবৃত্তি, অনাহার, সপরিবারে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে বহু ব্রাহ্মণপরিবার ধ্বংস হয়, অথবা বংশানুক্রমিক শাস্ত্রচর্চা বা বিদ্যাচর্চার কুলবৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হয় । এই আর্থিক সংকট সমাধানের উপায় হিসাবে কৌলীন্যের সামাজিক অধিকারকে এই সময় থেকে অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। ফলে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে বহুবিবাহপ্রথা অস্বাভাবিক বিস্তারলাভ করে।

বদ্ধ কুলগত আচারের সুড়ঙ্গপথে বহুবিবাহের সূত্র ধরে ক্রমশ বহু

ব্যভিচার ও দুর্নীতি সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়। আর্থিক সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় দুর্নীতি ও ব্যভিচার। 'অন্যপূর্বা' বিবাহ বা 'বিমাতাবিবাহ' রূপ বীভৎস আচারও এই সূত্রে কুলীন সমাজে বহুলপ্রচলিত হয়। পূর্বে বংশজ বা গৌণকুলীনকন্যা গ্রহণ করলে কুলীনের কুলভঙ্গ হত । তিনি তখন বংশজে পরিণত হতেন। কিন্তু পরে এই ভঙ্গকুলীন পাঁচপুরুষ পর্যন্ত কুলীনমর্যাদা লাভ করতে থাকেন। বিশেষত প্রথম তিন পুরুষ পর্যন্ত ভঙ্গকুলীনদের বিবাহের বাজারদর কুলীন হিসাবে অত্যন্ত উঁচু ছিল। শ্রোত্রিয়, বংশজ ও গৌণকুলীন কন্যার অভিভাবকবৃন্দের কাছে এই পাত্র বিশেষ বাঞ্ছিত বিবেচিত হত। কারণ কুলভঙ্গে ইচ্ছুক কুলীনপাত্রে কন্যাদান অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। কিন্তু একবার কুলভঙ্গ করলে ভঙ্গকুলীনেরা অপেক্ষাকৃত কমলাভে অকুলীন কন্যা গ্রহণে সম্মত হতেন। অকুলীন কন্যার অভিভাকবৃন্দ এই সুযোগ গ্রহণে তৎপর ছিলেন। বিবাহিত স্ত্রীর কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে না অথচ কিঞ্চিৎ লাভের আশা আছে এই বিবেচনায় ভঙ্গকুলীনগণ ক্রমে অনেক বিবাহ করেন এবং বিষয়টিকে ব্যবসায়ে পরিণত করেন। এক বহুবিবাহকারী 'ঠাকুরদাদা' স্থানীয় কুলীনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন যে শ্বশুরবাড়িতে ''ভিজিট' অনুযায়ী তিনি যান। বিগত দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি কিছু টের পাননি, আরামেই ছিলেন।[৮১]

এই জাতীয় বিবাহব্যবসায়ী কুলীনগণ বিবাহের সময় বরপণ ছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নানা অজুহাতে অর্থ আদায় করতেন। বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পণের পরিমাণ ব্যস্তানুপাতিক হারে হ্রাসপ্রাপ্ত হত। কুলীনপ্রথার অনিবার্য ফলস্বরূপ এই ভাবে কালক্রমে নানা কারণে বহুবিবাহের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বস্তুত এই সময়ে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে কৌলীন্য বা বংশমর্যাদাই ছিল প্রধান বিচার্য বিষয়। ফলে নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত, উপার্জনহীন বা অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণ শুধু বংশমর্যাদার জোরে সাধ্যানুযায়ী বরপণ আদায় করে অসংখ্য বিবাহ করত। অন্যদিকে পাত্রের অভাবে অনেক কুলীন কন্যাকে প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত বা আজীবন অবিবাহিত থাকতে হত।

বিবাহিত কুলীন কন্যার জীবনও প্রায় অনূঢ়ার মতোই পিত্রালয়ে অতিবাহিত হত।[৮২] স্বামী সাক্ষাৎ ঘটত কদাচিৎ। বহু কুলীনের পঞ্চাশ, ষাট বা ততোধিক স্ত্রী থাকায় মাত্র অল্প কয়েকজন স্বামীগৃহে আশ্রয়লাভ করত। কখনো কখনো একই পরিবারের একাধিক অনূঢ়া কন্যার একপাত্রের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হত। প্রসন্নময়ী দেবী জানান যে লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পিতার পিতৃষ্বসার বিবাহ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে প্রসন্নময়ীর পিতৃষ্বসার বিবাহ হয়।[৮৩] কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষার্থে এই রকম অদ্ভুত বিবাহ অনুষ্ঠান সেকালের সমাজে আদৌ রুচি বিগর্হিত বোধ হত না। কোনো মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে একই পরিবারের দিদি পিসি ভাইঝি প্রভৃতি দশ বারোটি কন্যার বিবাহের ঘটনার কথাও অশ্রুতপূর্ব ছিল না, যেহেতু বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পরে অবিবাহিত নারীর স্বর্গবাস হয়না, সেইজন্য মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সঙ্গেও এই প্রকার নামমাত্র বিবাহ প্রচলিত ছিল। ঐ মেয়েদের পরলোকেস্বর্গবাসের পথ প্রশস্ত হলেও ইহলোকে হয়ত কয়েকদিনের

মধ্যেই একসঙ্গে তারা বিধবা হত। কুলীনদের বিবাহে সংখ্যা প্রায়ই এত অধিক হত যে একটি খাতাতে তাঁরা বিবাহিত স্ত্রীদের নাম পরিচয় লিখে রাখতেন এবং প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী তাঁরা বিভিন্ন শ্বশুরালয়ে পালাক্রমে 'ভিজিট' দিতেন। নিস্তারিণী দেবী জানান তাঁর পিতামহেরও এইরূপ একটি খাতা ছিল। তার একপাশে তাঁর ৫৬টি বিবাহের ঠিকানা লেখা, অন্য পাশে টাকা বা পাওনাদেনার কথা লেখা থাকত। তাঁরবৃদ্ধ পিতামহের বিবাহ ছিল ১০৮ টি।[৮৪]

জামাতার কুলমর্যাদার জন্য নানা উপলক্ষ্যে তাঁকে টাকা দিতে হত। শ্বশুরালয়ে জামাতার উপবেশন, স্নানাহার, এমনকি আলাপ পর্যন্ত সম্ভব হত শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে। সর্বোপরি ছিল শয্যাগ্রহণী। অর্থাৎ টাকা না দিলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করবেন না। সমকালীন একজন নারীর রচনা থেকে জানা যায় যে কুলীন স্ত্রীরা নিজেরা অনেক সময় এইজন্য নিয়মিত চরকা কেটে টাকা উপার্জন করে সঞ্চয় করে রাখতেন।[৮৫] নিস্তারিণী দেবী জানান তাঁর 'লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো' রূপবতী কিন্তু অতি মুখরা ঠাকুমা জগদম্বার পিত্রালয়ে যেদিন স্বামী যান সেদিন তাঁর স্বভাবও 'লক্ষ্মীঠাকরুণটির মতো কোমল' হয়ে যায়। অতি দরিদ্র সংসারে দাদা ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে জামাতার আপ্যায়ন করেন। পা ধোয়ানি, নমস্কারি, ভোজনদক্ষিণা ইত্যাদি ছাড়া কুলীন জামাতা শ্বশুরগৃহের কোনোরকম আতিথ্য স্বীকার করবেন না। রাত্রে স্বামীর মানরক্ষার জন্য জগদম্বা তাঁর যথা সর্বস্ব অলঙ্কার, কাঁসার পঁইচে মুড়কি মাদুলি খুলে দেন। কিন্তু তবুও তিনি যে স্বামীর কাজে লেগেছেন এই অনুভূতিতে কৃতার্থ হয়ে যান। স্বামী অবশ্য পরদিন যাবার সময় কড়ির আলনা থেকে তাঁর লালপেড়ে শাড়িখানিও নিয়ে যান।

প্রথাবদ্ধভাবে বিবাহ ব্যবস্থার এই অবমাননা এবং স্ত্রীর প্রতি এই রকম অশ্রদ্ধার ফলে কুলীন সমাজে বিবাহ প্রকৃতই একটি প্রহসনে পরিণত হয়। এই প্রথার অনিবার্য ফল ছিল সমাজে ব্যাপক অনাচার ও ব্যভিচার এবং আশ্চর্যের বিষয় সমাজ সব জেনেও এই দুর্নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রথমত কুলীননারীর জীবনে সুখ বা শান্তির কোনো আশা ছিল না। হয় সে চির অনূঢ়া অথবা নামমাত্র বিবাহিত। উভয়ক্ষেত্রেই চিরদিন পিতৃগৃহবাসী এবং অবমাননাকর জীবন বহনে বাধ্য।[৮৬] সংসারে দাসীর মতো পরিশ্রম করা এবং এতৎ সত্ত্বেও তাচ্ছিল্য ও শারীরিক নির্যাতন ভোগ ছিল তাদের বিধিলিপি। বস্তুত আপন বংশমর্যাদাই ছিল তাদের দুঃখের হেতু। নিস্তারিনী দেবীর আত্মকথা 'সেকেলে কথা' আসলে একজন কুলীন নারীর দাদা, ভাই, ভাইপোর আশ্রয়ে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর দীর্ঘ জীবনের বাস্তব চিত্র।

এইভাবে কুলীনপ্রথা ও বহুবিবাহ দাম্পত্যসম্পর্কের প্রাচীন ঐতিহ্যগত রীতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়। ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত রচিত সাহিত্যসৃষ্টিতে দাম্পত্যজীবনে স্বামীর ভরণপোষণের আকাঙ্ক্ষার চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বহুবিবাহকারী কুলীনের স্ত্রী এই স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। স্বামীর তত্ত্বাবধান বা স্বামীর উপার্জনে গ্রাসাচ্ছাদনের দাবির সাহস ও পরিবেশ কুলীন স্ত্রীর কাছে প্রায়ই অলীক স্বপ্ন।

নিস্তারিণী দেবী বলেন, ''পত্নীর ভরণপোষণ একটা কর্তব্যের মধ্যে'' একথা তখনকার কুলীন স্ত্রীরা কল্পনাও করতে পারত না।

ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বহুবিবাহকারী কুলীন ব্রাহ্মণদের এক তালিকা পেশ করা হয়। তাতে দেখা যায় যে ২৭ জন ব্রাহ্মণের মোট ৮১৮ জন স্ত্রী। জনৈক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২ জন স্ত্রীর মালিক হয়ে তালিকায় শীর্ষ স্থানাধিকারী। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বহুবিবাহ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর দুটি তালিকা প্রকাশ করেন— একটি হুগলী জেলার কুলীন বহুবিবাহকারী ব্রাহ্মণের তালিকা, অন্যটি হুগলী জেলার জনাই গ্রামের অনুরূপ তালিকা। হুগলী জেলার তালিকায় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় শীর্ষস্থানীয়— ৮০টি বিবাহ, জনাইয়ের তালিকায় ৬৪ জন ব্রাহ্মণের একাধিক স্ত্রী, সর্বোচ্চ বিবাহকারী মহানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর সংখ্যা ১০।

কুলীন পিতার পক্ষে কন্যাসন্তান ছিল দুর্দশার আকর। অসাধারণ রূপলাবণ্যের অধিকারী কুলীনকন্যা নিস্তারিণী দেবী বালিকা বয়সেই ঠাকুমা, পিতা,দাদার চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। শুধু মায়ের চোখে তিনি 'কুমারীপূজার কুমারীর ন্যায়' থাকেন। কন্যা ঋতুমতী হবার আগেই বিবাহদান কর্তব্য নতুবা অভিভাবকগণ ভ্রূণহত্যা পাপে নরকগামী হন। কুলীনপাত্র দুর্লভ ও তাঁর বাজারদর চড়া। কিন্তু অকুলীন পাত্রে কন্যাদানও দেশাচারবিরুদ্ধ। সুতরাং অস্বচ্ছল কুলীনকন্যার পিতা বৃদ্ধ বা যৌবনোত্তীর্ণ বহুবিবাহকারী কুলীনপাত্রের সন্ধানে থাকেন। সন্ধান করে এমন পাত্র জোগাড় করতে পারলে পরিবারস্থ সব ক'টি বা যতগুলি সম্ভব অনূঢ়া কন্যার এক যোগে একপাত্রে দান করতে প্রস্তুত হন।[৮৭]

বহুবিবাহের আর একটি অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল ছিল বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুর অর্থই ছিল অনেকের বৈধব্য, দুর্ভাগ্যবশত বেশির ভাগই বালবিধবা। বালবিধবার এই অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি সমাজে আরো বহু গুরুতর সমস্যার জন্ম দেয়।

তৃতীয়ত বঞ্চিত ব্যর্থযৌবনা কুলীননারী প্রায়শ চিরকাল পিতৃগৃহবাসী(সধবা অথবা কুমারী)। অনেক সময়েই যৌবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাঁরা প্রলুব্ধ হন। প্রলোভনের সঙ্গীর ভরসায় গৃহত্যাগও করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় এক কুলীন স্ত্রীর চিঠি প্রকাশিত হয়। তিন বছর বয়সে বিবাহের পরে ষোল বছর বয়সে তাঁর প্রথম স্বামী সাক্ষাৎ ঘটে। রাত্রিতে তরুণী স্ত্রীকে বৃদ্ধ ও কুরূপ স্বামীর সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করতে হয়। এরপরে স্বামীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু যৌবনের তাগিদে তিনি পথভ্রষ্ট হন।[৮৮]

এমন ঘটনা বিরল ছিল না যে স্বামীর সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ হয়নি কিন্তু কুলীন স্ত্রী সন্তানপ্রসব করছেন। অবৈধ গর্ভ সঞ্চার অনেক ক্ষেত্রেই ঘটত। এর কয়েকটি সমাধান ছিল। গর্ভপাতের জন্য গ্রামের এক শ্রেণীর নারীপ্রদত্ত টোটকা ওষুধ ব্যবহৃত হত। অবশ্য এর ফলে কখনো কখনো গর্ভবতীর মৃত্যু ঘটত। সামাজিক কলঙ্ক এড়াবার জন্য

আবার এধরণের গর্ভবতী কুলীন স্ত্রীকে হত্যা করবার রেওয়াজও প্রচলিত ছিল। কোনো গ্রামে দশবছরের মধ্যে এইরকম বত্রিশ তেত্রিশটি কুলীনকন্যাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা অসম্ভব ছিল না।[৮৯] কিন্তুঅবৈধ গর্ভের সবচেয়ে সহজ সমাধান ছিল গর্ভকে বৈধ করে নেওয়া। জামাতাকে নিমন্ত্রণ করে এনে যথোপযুক্ত অর্থদানের বিনিময়ে সন্তুষ্ট করতে পারলে জামাতা ঐ অবৈধ গর্ভকে নিজের বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। জামাতাকে না আনতে পারলে আর একটি পথ ছিল। ঐ কন্যার মা বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়া একদিন ঘোষণা করতেন যে পূর্বরাত্রে জামাতা হঠাৎ এসেছিল, কিন্তু খুব ব্যস্ত থাকায় প্রত্যূষেই চলে গেছে। এই ভাবে কুলীন স্ত্রীর সঙ্গে একবারও মিলন না হলেও কুলীন পিতা একদিন পুত্রের সাক্ষাৎ হয়ত পেতেন।

কুলীন প্রথার আর একটি কুফল হল বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি। দাম্পত্যজীবনবঞ্চিত পিতৃগৃহবাসী কুলীন স্ত্রী কখনো প্রলোভনে পড়ে কারো সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে তার আর সমাজে ফেরার কোনো উপায় থাকত না। সুতরাং পতিতাবৃত্তি অবলম্বনই ছিল তার জীবন ধারণের উপায়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার হেল্‌থ অফিসারের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় তৎকালীন নিবন্ধীকৃত বেশ্যাদের মধ্যে কুলীনস্ত্রীর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না।[৯০]

কৌলীন্যপ্রথায় জামাতা সংগ্রহের জন্য যে বরপণ প্রচলিত হয়েছিল কালক্রমে তা সমাজের অন্যস্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত বংশকৌলীন্য ছাড়াও ইতিমধ্যে আর এক ধরণের কৌলীন্য সমাজে গড়ে উঠেছিল— বিদ্যা ও বিত্ত কৌলীন্য। এঁরাও কন্যাপক্ষের কাছ থেকে যথাসাধ্য অর্থ আদায় করতে আরম্ভ করেন। কৌলীন্যপ্রথার ফলে সমাজে আরো একটি সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দেয়। সমস্যাটি হল শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কন্যাসংকট। কুলীনপাত্রের পক্ষে যেহেতু এই দুই শ্রেণী থেকে কন্যাগ্রহণে বাধা ছিল না এবং যেহেতু এই দুই শ্রেণীর কন্যার অভিভাবকবৃন্দ কুলমর্যাদায় ঊর্দ্ধগামী হবার জন্য প্রাণপণ অর্থব্যয়ে কুলীনপাত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতেন, তাই এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাত্রদের বিবাহের প্রয়োজনে কন্যার নিদারুণ অভাব দেখা দিত। কন্যার অভিভাবকগণ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কন্যাপণ আদায় করতে থাকেন। কুলীনদের বহুবিবাহের মতোই অকুলীন সমাজে কন্যাবিক্রয় প্রথা ব্যবসায়ে পরিণত হয়। কন্যার পিতা পাত্রের রূপগুণ বা বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই যাচাই না করে সর্বোচ্চ মূল্যদাতাকে কন্যাদান করতেন। কন্যাপণের পরিমাণ কন্যার বয়সের উপর নির্ভরশীল ছিল। শিশু কন্যার তুলনায় বালিকা এবং বালিকার তুলনায় কিশোরীকন্যার বিক্রয়হার চড়া। জানা যায় মধ্যবিত্ত পরিবারে বালিকাকন্যার মূল্য ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে সাতশত থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত এবং কিশোরীকন্যার মূল্য বারশত টাকা পর্যন্ত ছিল। কন্যা ক্রয়ের জন্য এই মূল্য তৎকালীন বিচারে অবশ্যই উচ্চ বলে গণ্য হবে। এই পণ সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় বহু শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণকে বাধ্য হয়ে অবিবাহিত থাকতে হয়। অনেক শ্রোত্রিয় ও বংশজ পরিবার এর ফলে লুপ্ত হয়ে যায়।[৯১]

পাত্রী সংগ্রহের জন্য যৎসামান্য সম্পত্তির মালিকের একমাত্র উপায় ছিল সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া। কেউ কেউ সারাজীবন কৃচ্ছ্র সাধন করে সাধ্যমতো অর্থসঞ্চয় করতেন। কেউ কেউ ঋণ করে বিবাহ করতেন ও সারাজীবন সেই ঋণশোধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। কেউ বা বিবাহ করতে না পেরে নিম্নশ্রেণীর নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। কন্যাবিক্রয় প্রথায় বাল্যবিবাহের প্রবণতাও বৃদ্ধি পেত। বালিকা বা কিশোরী কন্যার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে অক্ষম শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণ অনেকেই শিশুকন্যা ক্রয় করতেন। অনেক অভিভাবকও নগদ বিদায়ের লোভে শিশুকন্যাকে বিবাহ দিতে আগ্রহী হতেন। এই বাল্যবিবাহের ফলে স্বভাবতই হয় বৈধব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত অথবা অসমবয়স্ক কন্যাবিবাহের ফলে কন্যা যখন যৌবনে উপনীত হত তখন বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি তার প্রেমসঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়শই থাকত না। অন্যদিকে ভাবী জামাতাকে শোষণ করে যে শ্বশুর কন্যাদান করেন তাঁর প্রতি জামাতার মনোভাব অনেক সময়েই অনুকূল থাকত না। শ্বশুরের প্রতি জামাতার এই বিরাগ বা বিদ্বেষ পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করত।

এই কন্যাবিক্রয় প্রথার প্রসারের ফলে এবং কন্যার অভাবহেতু বিষয়টি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ার ফলে একশ্রেণীর মানুষ ব্যাপক অসাধুতা আরম্ভ করে। অনেক সময়েই ব্রাহ্মণেতর নীচ শ্রেণীর এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা অজ্ঞাত-কুলশীল কন্যাদের কম মূল্যে ক্রয় করে নৌকাযোগে অনেকগুলি কন্যাসহ ব্যবসায়ীগণ গ্রাম গ্রামান্তরে বিক্রয়ার্থ নিয়ে যেত এবং এই ''ভরার মেয়েদের'' ব্রাহ্মণকন্যা হিসাবে চড়া মূল্যে শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করা হত।[৯২] এই ভাবে কন্যাবিক্রয় প্রথা বহু সামাজিক দুর্নীতি, ব্যভিচার, অন্যায় ও অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে সচেতনতার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ''আত্মীয় সভা''র অধিবেশনে। বস্তুত বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতিটি বিষয়েরই প্রায় প্রাথমিক কর্মসূচীর খসড়া এই 'আত্মীয় সভা'য় রচিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে'র আত্মীয় সভার অধিবেশনের বিবরণ ১৮ মে'র 'ক্যালকাটা জার্নালে' প্রকাশিত হয় এবং এই সভায় অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে বহুবিবাহ প্রসঙ্গও আলোচিত হয়। রাজা রামমোহন তাঁর Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on Ancient Rights of Females গ্রন্থে যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করেছেন যে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু পরবর্তী টীকাকারগণের ব্যবস্থায় নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হওয়ায় পুরুষের বহুবিবাহ সমাজে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ত্রীর সংখ্যা অধিক হলেও বিত্ত ও সম্পত্তি ভাগ হবে না এই জ্ঞান পুরুষদের বহুবিবাহে প্ররোচিত করে। উপরন্তু তিনি আরো দেখিয়েছেন যে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন স্ত্রী দুশ্চরিত্র, সুরাসক্ত অথবা বন্ধ্যা হলে) পুরুষের দারান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলেও ঢালাও বহুবিবাহের অধিকার স্বীকার করা হয়নি। রামমোহনের মতে কোনো ব্যক্তি এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণে ইচ্ছুক হলে শাস্ত্রবর্ণিত কোনো দোষ স্ত্রীর আছে তা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রমাণ করে শুধু তবেই নতুন বিবাহের অনুমতি লাভ করতে পারবে। এই নিয়ম যদি সরকার বাধ্যতামূলক

করেন তাহলে বহুবিবাহের নিবারণ হবে এবং নারীজাতির দুর্দশারও লাঘব হবে।[১৩]

সম্ভবত রামমোহনের যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক সরকারের কাছে বহুবিবাহবিরোধী এক আবেদনপত্র প্রেরণের পরিকল্পনা করেন।[১৪] ১৮৩০ এর দশকে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী কুলীন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করতে থাকে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা বহুবিবাহকারী কুলীনদের একটি তালিকা প্রকাশ করে প্রথাটির বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা করে। ডিরোজীয়ানদের আলোচনাসভা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সমিতি'র বিভিন্ন অধিবেশনেও প্রথাটির বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক আলোচনা হয়। উক্ত সভায় মহেশচন্দ্র দেব ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে A sketch of the condition of the Hindoo Woman নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে কুলীন বহুবিবাহকে ধিক্কার জানানো হয়।[১৫]

এরপর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা এই প্রথাটির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়। এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাদর্শন পত্রিকার ১৭৬৪ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'বহুবিবাহের' বিরুদ্ধে কঠোর যুক্তিবাদী যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তা সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্ত স্বয়ং রচনা করেন। পরবর্তী ভাদ্রসংখ্যায় চিঠিপত্র স্তম্ভে এই বিষয়ে আরো আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায়ই 'অধিবেদন' নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যাদর্শন 'রাজনিয়মের' দ্বারা 'কুকর্মের' উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কার্তিক সংখ্যায় 'এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ' পত্রে জনৈক বেশ্যা জানান একদা বঞ্চিত কুলীনস্ত্রী তিনি কিভাবে পরে ভ্রষ্ট হন। উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে পুনরায় কুলীনপ্রথার ত্রুটিসমূহ আলোচিত হয়। এইভাবে বিদ্যাদর্শন পত্রিকা বহুবিবাহ ও কুলীনপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের এক মানসিক ভিত্তিভূমি গড়ে তোলে। জনমতও ক্রমশ জাগ্রত হয়। বিনয় ঘোষ মনে করেন বহুবিবাহ আন্দোলনের তাত্ত্বিক সংগঠক ও প্রধান পরিকল্পক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বহুবিবাহ উচ্ছেদকল্পে 'রাজনিয়মের' যৌক্তিকতা অক্ষয়কুমারই সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Calcutta Review পত্রিকায় The Kulin Brahmins of Bengal নামে বিস্তৃত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইভাবে তিনিও সমস্যাটি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে সরকারের কাছে প্রথম আবেদনপত্র প্রেরিত হয় 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদসমিতি'র পক্ষ থেকে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সূচনায় কিশোরীচাঁদ মিত্র সমিতির মুখপাত্র হিসাবে এই আবেদন প্রেরণ করেন। ঐ বছরই ২৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরও ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদন পেশ করেন। বর্ধমানের মহারাজা এই আবেদন পত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। পরে প্রায় একশসাতাশখানি আবেদনপত্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। এই সমস্ত আবেদনপত্রে দশ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি স্বাক্ষরদান করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সূচনায় স্বাক্ষরসংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজারে পৌঁছায়।[১৬]

ব্যবস্থাপক সভার প্রভাবশালী সদস্য জে. পি. গ্রান্ট ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি জানান যে শীঘ্রই এবিষয়ে একটি বিল সভায় উত্থাপন করা হবে। রমাপ্রসাদ রায়ের সহযোগিতায় গ্রান্ট আইনের একটি খসড়া প্রস্তুতও করেন, কিন্তু এই সময় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় বিষয়টি স্থগিত হয়ে যায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ মল্লিক, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক প্রমুখ প্রায় ১৫৮০ জন ব্যক্তি ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ নিষেধক আইন প্রণয়নের আবেদন জানান। বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বহুবিবাহ নিবারণকল্পে এক খসড়া আইন প্রস্তুত করে বড়লাট লর্ড এলগিনের কাছে কৌন্সিলে পেশ করবার জন্য প্রেরণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র বাংলার ছোটলাটের কাছে প্রেরিত হয়। ১৯ মার্চ রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছোটলাট সিসিল বীডনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনপত্রটি অর্পণ করেন। বর্ধমানের মহারাজা আর একটি আবেদনপত্র পাঠান, রাজা সত্যশরণ সেটিও ছোটলাটের কাছে পেশ করেন। বীডন জানান পূর্বে যখন একবার আইন প্রণয়নের চেষ্টা হয়েছিল তখন থেকেই তিনি সমস্যাটি বিষয়ে সম্যক চিন্তা করছেন। এখনও তিনি এই বিষয়ে যথাসাধ্য করবেন।[৯৭]

১৮৬৬, ৫ এপ্রিল বাংলাসরকার ভারত সরকারকে বহুবিবাহনিবারণ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে পত্র দেন। উত্তরে ভারত সরকার জানান যে বহুবিবাহ প্রথা একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ ব্যক্তি এমনকি শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ এই প্রথা সমর্থন করেন। সুতরাং সরকারের পক্ষে এখন এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হবে না। অতঃপর বাংলা সরকার বহুবিবাহ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সাতসদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সদস্যরা হলেন সি পি হবহাউস, এইচ টি প্রিন্সেপ, সত্যশরণ ঘোষাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এবিষয়ে বাংলা সরকার ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারকে জানান যে আইনের সাহায্য ছাড়া এই দৃঢ়মূল সমাজিক কুপ্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে না এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য আইন প্রণয়ন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত কমিটির দুজন সদস্য সত্যশরণ ঘোষাল ও বিদ্যাসাগর আইন প্রণয়নের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে বাকি তিনজন বাঙালি সদস্য মত প্রকাশ করেন যে শিক্ষাবিস্তার ও উন্নত সমাজচিন্তার প্রভাবে ধীরে ধীরে কুলীন ব্রাহ্মণগণ একবিবাহের পক্ষপাতী হবেন। সুতরাং আইন প্রণয়ন বাহুল্য।[৯৮] ভারত সরকারের উৎসাহের অভাবে বহুবিবাহ আইন প্রণয়ন স্থাগিত থাকে। পরে এবিষয়ে আর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ নিষেধক আবেদনপত্র প্রদত্ত হওয়ায় অকুলীন ব্রাহ্মণগণ কুলীনত্ব লোপ পেয়ে সকলে সমান হবে এই আশায় উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কিন্তু অনেকে মনে করেছিলেন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলে বরং কৌলীন্যের কলঙ্ক নিবারিত হয়ে কুলীনের গৌরব বৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে, বহুবিবাহ আইন সরকার কেন পাস

করছেন না সে বিষয়ে 'সম্বাদ ভাস্কর' তীব্র অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে। সম্পাদকীয় স্তম্ভে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে জুলাই, ১৮৫৬ তে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়েছে। গৌরীশঙ্কর সুস্পষ্টভাবে মনে করেন বহুবিবাহনিষেধক আইন প্রবর্তিত না হলে বিধবাবিবাহ আইনের কার্যকারিতা থাকবে না।[৯৯]

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত বিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরবৎসর প্রকাশিত হয় এবিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তিকা। পুস্তিকাদুটির মাধ্যমে বিদ্যাসাগর কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি, বিকাশের ইতিহাস ও কুফলসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রতিকারস্বরূপ তিনি মনে করেন "পুনরায় সর্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন.....পথ নাই"। প্রথম পুস্তিকাতেই উপরোক্ত প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং আরো বলেন "রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না"। উপরন্তু প্রথম পুস্তিকার মুখবন্ধেও তিনি জানান "রাজশাসন ব্যতিরেকে ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই"[১০০] দুটি পুস্তিকাতেই বিদ্যাসাগরের রচনারীতি তীব্র শ্লেষাত্মক। পুস্তিকাদুটি পোলেমিক্যাল, সুতরাং পোলেমিক্স্ এর ধর্ম অনুযায়ী রচনার সুর যথেষ্ট উঁচু পর্দায় বাঁধা। দ্বিতীয় পুস্তিকায় তিনি প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করেন। কিন্তু বহুবিবাহনিবারণপন্থীদের অনেকের মত ছিল শিক্ষার প্রসার ও সর্বদ্বারী বিবাহের পুনঃপ্রচলন হলে বহুবিবাহ ধীরে ধীরে লোপ পাবে, সরকারি আইন প্রয়োগের প্রয়োজন নেই । বহুবিবাহের সমর্থকরা মনে করতেন এটি একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা, সুতরাং সরকারি হস্তক্ষেপ একেবারেই অবাঞ্ছিত। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক এবং বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তিনিও আইন পাস করে সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রস্তাব ছিল যে একধিক বিবাহকারীর উপর ট্যাক্স ধার্য করা উচিত । অবশ্য তিনি একথা চিন্তা করেননি যে সরকারই একমাত্র ট্যাক্স ধার্য করতে পারে। অতঃপর 'সোমপ্রকাশে' বিদ্যাসাগরের পত্র, সম্পাদকীয় উত্তর, তারানাথ তর্কবাচস্পতির চিঠি, কৈলাসনাথ বসুর চিঠি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে তর্কবিচার চলতে থাকে। এমন কি 'সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভার' মতো প্রতিষ্ঠানও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয় এবং এই সভার সভ্যগণ সরকারের নিকট আবেদন না করে নিজেরা যাতে কৌলীন্যপ্রথা উচ্ছেদে যত্নবান হন সোমপ্রকাশ সম্পাদক তাঁদের সেই পরামর্শ দেন।[১০১]

'বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ' এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন থাকলেও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় তিনি বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ' সম্বন্ধীয় পুস্তিকাদুটিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। প্রথমত রচনারীতির দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর 'অশ্লীলতাদোষে' দুষ্ট। দ্বিতীয়ত বিদ্যাসাগর প্রদত্ত বহুবিবাহকারীর তালিকা 'প্রমাদশূন্য' নয় এবং "বহুবিবাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা.....সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।" আর, যদি একথা সত্য নাও হয়, তবু বহুবিবাহের

অশাস্ত্রীয়তা বিচারের প্রয়োজন নেই। "যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নেই;" কিন্তু তিনি বহুবিবাহ নিবারণে রাষ্ট্রীয় আইনের শরণ গ্রহণ করা অনুচিত মনে করেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, "এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে"।১০২

বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর আক্রমণাত্মক রচনার দ্বারা বিদ্যাসাগর যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হন, কিন্তু বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা যেমন ফরিদপুর, ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। বিশেষত ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। রাসবিহারী স্বয়ং কুলীনসন্তান, প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত ও ইংরেজি অনভিজ্ঞ ছিলেন। দারিদ্র্যহেতু তাঁকে বহুবিবাহ করতে হয়। কিন্তু ক্রমে তিনি বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে সচেতন হয়ে যথাশক্তি এর উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করেন। বক্তৃতাদান, পুস্তিকরচনা ও বিতরণ, ছড়া ও গান রচনা, ব্যাপক ভ্রমণ ইত্যাদির সাহায্যে তিনি এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন ও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের ব্যয়ভার বিদ্যাসাগরই বহন করেন। ঢাকার গোঁড়া হিন্দুগণও অনেকে রাসবিহারীকে সমর্থন করেন।

রাসবিহারীর আন্দোলন সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'ভারতসংস্কার' পত্রিকা পৃথকভাবে সপ্রশংস উল্লেখ করে জানায় যে প্রাচীন হিন্দুগোষ্ঠীভুক্ত রাসবিহারীর নেতৃত্বে এই আন্দোলনে গোঁড়া হিন্দুসমাজ ও হিন্দু পণ্ডিতগণও সমর্থন করেছেন। কোনো নব্য ইংরেজিভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হলে হিন্দুসমাজ এই ভাবে তাঁকে সহায়তা করত না। রাসবিহারী রচিত গানগুলি পূর্ববঙ্গ বহুবিবাহ আন্দোলনে প্রায় লোকসঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করে এবং পুরুষ ও মেয়েদের মুখে মুখে এইগান ফেরে। তিনি নিজ পুত্র ও কন্যার অন্য মেল'ভুক্ত পরিবারে সম্বন্ধ করেন এবং ক্রমশ তাঁর দৃষ্টান্তে উৎসহিত হয়ে অনেকেই নামমাত্র কুলীন সৎপাত্রে কন্যা প্রদান করতে লাগলেন।[১০৩]

রাসবিহারীর এই আন্দোলনের জন্য তাঁকে বহু সামাজিক উৎপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তাছাড়া তাঁর কঠোর দারিদ্র্যও কম ক্লেশকর ছিলনা। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় এবিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ করা হয়। রাসবিহারী ছাড়াও ব্রজসুন্দর মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা পূর্ববঙ্গের বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। অন্যদিকে সাহিত্যিক সংবাদিক মনোমোহন বসু সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা ও জাতীয় সভার সক্রিয় সদস্য হিসাবে বহুবিবাহের প্রতি তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করেন। বক্তৃতাদান ছাড়াও তিনি বহুবিবাহের ত্রুটিসমূহ প্রকাশ করে নাটক রচনা করেন। 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকে তিনি বলেন, "'পরিণয়' এই বাক্য অতি সুধাময়। "বহু" শব্দ যোগে কিন্তু বিষময় হয়!!"[১০৪] নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুস্পষ্ট ভাবে জানান প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায় শুধু নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ অগৌরবের বস্তু। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীও বিপত্নীকের পুনর্বিবাহকে বহুবিবাহ মনে করেন ও তার নিন্দা

করেন।

এছড়াও কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহবিরোধী অনেকগুলি পুস্তিকাও জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরচিত 'কুলকালিকা' (কলিকাতা, ১৮৭৩), কালিদাস মুখোপাধ্যায় রচিত 'কৌলীন্যপ্রথাসংশোধনী সভা, (কলিকাতা, ১৮৭১), ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দুঃখিনী কুলীন কামিনী' (কলিকাতা, ১৮৭২), শ্রীনাথ সিংহ রচিত 'কুলরহস্য কাব্য' (মুর্শিদাবাদ, ১৮৭৭), বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত 'আমোদিনী' (কলিকাতা, ১৮৭৮) প্রভৃতি পুস্তিকা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক (১৮৫৪) যদিও আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু নাটকটি কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ বিরোধী এক সচেতনতা জাগাতে সক্ষম হয়। এছাড়াও দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'লীলাবতী' (১৮৬৭)। 'জামাই বারিক' (১৮৭২) এবং আরো কয়েকজন নাট্যকারের নাটকে এই সমস্যার কুফলসমূহ প্রকটিত হয় এবং জনমত সৃষ্টিতে এইসব নাটক ও নাটকাভিনয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত ৭০ এর দশকেই দেখা যায় নানাকারণে বহুবিবাহের. প্রবণতা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছিল। বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা রচনার সময়ই বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করেছিলেন যে কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে এই কুপ্রথা অনেক অংশে নিবৃত্ত হয়েছে, যদিও এই অঞ্চলের বাইরে কুলীন প্রথার 'প্রাদুর্ভাব তদবস্থই' আছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আদি সমাজ প্রস্তাবিত ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করবার সময় জানায় যে শিক্ষাগুণে বহুবিবাহ এমনিতেই হ্রাস পাচ্ছে। 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থেও বলা হয় যে বহুবিবাহ প্রায় রহিত হয়েছে। বামাবোধিনী পত্রিকা জানায় যে বিদ্যা ও সভ্যতার আলোকে বহুবিবাহ ক্রমে অন্তর্হিত হচ্ছে।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কুলীনস্ত্রী ও তাঁদের অভিভাবকগণও ক্রমশ কুলীনস্ত্রীদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিতে থাকেন। কৃষ্ণমণি নামে এক কুলীনস্ত্রী স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা করে জয়লাভ করেন। আদালতের রায় অনুযায়ী স্বামী দারিদ্র্যবশত পনেরো টাকা দিতে অক্ষম হন এবং তার কারাদণ্ড হয়। কয়েকবছর পরে কুলীনস্ত্রী হৈমবতী দেবী স্বামীর বিরুদ্ধে একই ধরণের মামলা করে হাইকোর্ট থেকে মাসিক দশ টাকা খোরপোষের ডিক্রি পান। ললিতমোহিনী নামে কুলীন মহিলাও অনুরূপ মামলায় জয় লাভ করেন। ধনী স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি বহু টাকার ডিক্রি পান এবং বাল্যবিবাহবিরোধী গ্রন্থ রচনার জন্য তিনশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ভাগ্যকুলের জমিদার ঘোষণা করেন যে কোনো কুলীনস্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা করলে তাঁকে তিনি দুইশত টাকা পুরস্কার দেবেন।[১০৫]

পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে সারদাকান্ত ও বরদাকান্ত হালদার, নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকদল বিপন্ন কুলীনকন্যাদের বহুবিবাহ থেকে উদ্ধার, সৎপাত্রে অর্পণ ইত্যাদি কাজে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সহায় এই যুবকদল ব্রাহ্ম আন্দোলনের, বিশেষত নারী উন্নয়নের কাজে অতি উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

এঁদের বহু অসমসাহসিক কাজের মধ্যে স্মরণীয় বিধুমুখী হরণ মামলা। বিধুমুখী নামক কুলীন কন্যার বিবাহ স্থির হয় বহুবিবাহকারী এক অতি বৃদ্ধের সঙ্গে। সারদানাথ ও বরদানাথ বিধুমুখীকে উদ্ধার করে বরিশালে দুর্গামোহন দাসের আশ্রয়ে রাখেন। বিধুমুখীর পিতৃব্য হরণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আদালতে বিধুমুখী স্বীকার করেন যে তিনি স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন। বিধুমুখী উপরন্তু প্রার্থনা জানান আদালত যেন তাঁকে এবম্প্রকার বিবাহ থেকে রক্ষা করে। মামলায় বিধুমুখীর জয় হয়। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও প্রথম ভারতীয় Comptroller of Accounts রজনীনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।[১০৬]

ঊনবিংশ শতকের শেষ তিন দশকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। বহুবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত নয় এই যুক্তির পরিবর্তে এখন থেকে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলন বা নব্য হিন্দুত্ববাদ উভয়েই এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল।[১০৭] এইসব আন্দোলন, শিক্ষার প্রসার, সচেতনতার বিকাশ ইত্যাদির বহুবিধ কারণে বহুবিবাহ প্রথা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া পরিবার সম্বন্ধে পূর্বতন ধারণারও ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে। যৌথ পরিবারগুলির ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরে, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের পরিবারিক বিন্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সতরাং কুলীনকন্যার অভিভাকগণ ভরণপোষণে ইচ্ছুক ও সক্ষম পাত্রের হাতেই কন্যাসম্প্রদান বাঞ্ছনীয় মনে করতে থাকেন।[১০৮]

তা সত্ত্বেও কৌলীনপ্রথা ও বহুবিবাহের প্রতি আনুগত্য সমাজের একাংশে প্রচলিত থাকে। শতাব্দীর শেষ দশকেও বরিশালের গ্রামে ১০৭ বিবাহকারী, বর্ধমানের গ্রামে ৬৫ বিবাহকারী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কুড়ি বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ যুবক ১১টি বিবাহ করেছেন এমন দৃষ্টান্তও অনুপস্থিত ছিল না। সমসাময়িক উপন্যাসে বহুবিবাহবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখেও অনুমান করা যায় সমস্যাটি একেবারে নির্মূল হয়নি। 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' উপন্যাসে রমেশচন্দ্র দত্ত, 'একটি চিত্র' (১৮৮৬) উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ বসু, 'স্নেহলতা' (১৮৯০) উপন্যাসে কুসুমকুমারী দেবী এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

বস্তুত কৌলীন্য অভিমান, বংশ মর্যাদার গুরুত্ব এবং অর্থনৈতিক সংকট এগুলির প্রভাব সমাজে তখনো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আন্দোলন ও সচেতনতাবৃদ্ধির ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশে যে প্রথাটির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল এবং সুস্থ পারিবারিক জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল এও সমাজের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ইসলাম ধর্ম যদিও সাম্যপন্থী ও শ্রেণীহীনতায় বিশ্বাসী, কিন্তু কালক্রমে কৌলীন্য প্রথার মতো মুসলিম সমাজেও অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বহুবিবাহপ্রথা মুসলিম সমাজে অভিজাত ও অনভিজাত উভয় অংশেই বিদ্যমান থাকলেও সেখানে মেয়েরা স্বামীর গৃহেই বসবাস করত। স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য দাম্পত্য অধিকার বা গ্রাসাচ্ছাদন থেকে মুসলিম নারী হিন্দু কুলীনকন্যার মতো সাধারণত বঞ্চিত হত না। কিন্তু প্রথাটিই স্বতঃসিদ্ধভাবে কুনীতিজনক। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে মুসলিম চিন্তাবিদগণ সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে থাকেন। ময়মনসিংহ জেলার

সাবডেপুটি নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী তাঁর 'বঙ্গীয় মুসলমান' গ্রন্থে (১৮৯০) বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে জানান যে বহুবিবাহরূপ কু-বৃক্ষের ফলে ''বহু সন্তানোৎপত্তি, গৃহবিবাদ, উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা'' ইত্যাদি সামাজিক অনিষ্টকারক ঘটনাগুলি ঘটে।[১০৯] ইংরেজিশিক্ষিত নব্য মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য পুরুষ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাঙালি মুসলিম মেয়েদের জীবনের নানা দুঃখ দুর্দশা ও অভাব অভিযোগ বিষয়ে বেদনাবোধ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য কিছু প্রগতি মনস্ক উদারপন্থী ব্যক্তির প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে বহুবিবাহবিরোধী কোনো আন্দোলন বা ব্যাপক সচেতনতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা যায় না।

কুলীন বহুবিবাহপ্রথার আনুষঙ্গিক প্রতিফল স্বরূপ কন্যাবিক্রয় বা কন্যাপণ প্রথা ব্রাহ্মণসমাজের একশ্রেণীর মধ্যে যে অনাচার ও দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটায় সে বিষয়েও ক্রমে সচেতনতা জাগ্রত হয়। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে রামমোহন কন্যাপণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বিবাহার্থে কন্যাবিক্রয় করা বা কন্যাক্রয় করা উভয়ই শাস্ত্রানুমোদিত নয় এবং এই দুই প্রথা যে পাপাচার রামমোহন তা শাস্ত্রবিচার করে প্রমাণ করেন। সুতরাং এইরকম বিবাহের স্ত্রী আদৌ প্রকৃত স্ত্রী নয় এবং তার সন্তানও প্রকৃত সন্তান নয়।

'সমাচার দর্পণ' ও 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা দুটিও অতঃপর কন্যাবিক্রয় প্রথাবিরোধী মতামত ব্যক্ত করতে থাকে। ফলে এবিষয়ে কিছু জনসচেতনতা জাগ্রত হয় এবং সমাচার দর্পণের পাতায় পাঠকদের মতামতের প্রতি ফলনও ঘটে।

সর্বপ্রকার সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে যারা প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেছিল সেই ইয়ং বেঙ্গল দলও কন্যাপণবিষয়ে বিরূপ মত প্রকাশ করে। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার পাতায় প্রথাটির কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করে রচনা প্রকাশ করা হয়।

কন্যাপণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমে আরো বৃদ্ধি পায় এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ সচেতন ব্যক্তিগণ তাঁদের নাটকের মাধ্যমে এবং বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে প্রথাটির কুফল বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন।[১১০]

যদিও সমাস্যাটির ব্যাপকতা সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বিবাহপ্রথার অবমাননা এবং কন্যাসন্তানের লাঞ্ছনার বিচারে সমস্যাটির গুরুত্ব অল্প ছিল না। ১৮৬০ এবং ৭০ এর দশকে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সাহায্যে প্রথাটির অবসানের চেষ্টা চলে। প্রধানত রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান 'সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা' এবিষয়ে তৎপর হয়। তাছাড়া ফরিদপুরের. বহুবিবাহ ও কন্যাপণনিবারণী সভা, বরিশাল রায়েরকাঠি গ্রামের এবং ঢাকা বিক্রমপুরের কয়েকটি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান প্রথাটির অবসান

কল্পে বিবিধ প্রয়াস চালায়।[১১১] কন্যাবিক্রেতা পিতাদের প্রতি সামাজিক চাপসৃষ্টি, বিনাপণে কন্যাদান করতে উৎসাহদান এবং প্রথাটি উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করতে সরকারকে অনুরোধ,এইগুলি ছিল তাদের কার্যক্রম।

এছাড়া ব্যক্তিবিশেষও নিজস্ব প্রচেষ্টায় এই প্রথাটির উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হন। শান্তিপুরের সমাজ-সংস্কারক দীনদয়াল উদ্যোগী হয়ে সমাজের সাহায্যে কয়েকজন কন্যাবিক্রেতা পিতাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও জাতিচ্যুত করেন।

এই সব বিবিধ প্রয়াস ও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সমাজসচেতনতা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, পারিবারিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি বহুবিবাহ ব্যবস্থার প্রতিকূলে ক্রিয়াশীল হওয়াতে এই কুপ্রথা সমাজ থেকে হ্রাস পেতে থাকে এবং কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা সত্ত্বেও অবশেষে প্রায় অপ্রচলিত হয়ে ওঠে।

(ঘ)

বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রয়াস

অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে নারীজীবন নানা দুর্গতির চাপে পিষ্ট হয়ে পড়েছিল। বস্তুত এই দুর্বিষহ জীবনের জন্য প্রধানত দায়ী ছিল বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা স্বতঃসিদ্ধভাবে নারীর সামাজিক দুর্গতির সমস্ত মূল কারণগুলিকে ধারণ করে। শিক্ষাহীনতা, অবরোধ, অকালবৈধব্য ইত্যাদির প্রাথমিক উৎস বাল্যবিবাহ। বৈদিক যুগে বরকন্যার পছন্দ ও যৌবনবিবাহ স্বাভাবিক থাকলেও ক্রমশ স্মৃতিশাস্ত্র-শাসিত যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোর আকার ধারণ করে এবং যৌবন বিবাহ ও নিজস্ব পছন্দ অপ্রচলিত হয়। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার নিশ্চিততম উপায় হিসাবে নারীর যৌনতাকে কঠিন শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার উদ্দেশ্যে নারীর বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হয়। কন্যা যখন প্রাকৃতিকভাবে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ ঋতুপূর্ব অবস্থা, তখন তাকে বিবাহার্থে সম্প্রদান করলে পরিবারের পুরুষ অভিভাবকের মর্যাদা স্বতঃই বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া সন্তানের পিতা কে একথা একমাত্র জননীই জানেন।[১১২] পিতৃত্ব, বংশধারা, উত্তরাধিকারকে সুনিশ্চিত করার উদ্বেগ থেকে সমাজ স্থায়ী ভাবে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে বাল্যবিবাহের মাধ্যমে।

মধ্যযুগে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার হতে থাকে, সাহিত্যেও এই প্রথাকে গৌরবান্বিত করে মত প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহপ্রথা বর ও কন্যা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে যায় এবং পঁচিশ বছরের অবিবাহিত পুরুষ বৃদ্ধের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়। ক্রমে উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ অনেকক্ষেত্রে শিশুবিবাহে পরিণত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের কাছেও বাল্যবিবাহ রোমান্টিকতার

আবহে আদরণীয় বোধ হয়।[১১৩]

শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহের অনিবার্য কুফলগুলি সমাজকে ক্রমশ অধঃপতিত করে তোলে। বালিকা কন্যা শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিকারী অন্যান্য গুণের অনুশীলনের প্রশ্ন অবান্তর ও অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে, অকাল যৌনতা ও অকাল সংসারপক্কতা তাকে গৃহ ধর্মপালনের একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রমাত্রে পরিণত করে। জীবনের সৌন্দর্য ও বিচিত্রব্যাপকতা বিষয়ে সে থেকে যায় অনবহিত। জীবনযাপনের অর্থ তার কাছে শুধু দৈনন্দিন দিনযাপন।

এছাড়া বাল্যবিবাহের জন্যই অসংখ্য বালবিধবার সম্ভাবনাও প্রস্তুত হয়। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ এই দুই প্রথার ফলে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে বালবিধবার অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে অন্যান্য সামাজিক কুফলগুলি ছাড়াও অন্য একটি ক্ষেত্রেও গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অগণিত বালবিধবার মাতৃত্বহীনতা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ, বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজের সংখ্যাগত অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। বাংলায় হিন্দু ও অহিন্দুর অনুপাতের বৈষম্যের কারণ হিসাবে বাল্যবিবাহ ও বালবিধবাকে খানিকটা দায়ী করা হয়।[১১৪]

বালবিবাহের ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে সমাজে সচেতনতার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত প্রবন্ধে মহেশচন্দ্র দেব নারীর অবরোধ, অভিভাবকনির্দিষ্ট বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহের উপর বিধিনিষেধ ইত্যাদি সমস্যা আলোচনা সূত্রে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মত ব্যক্ত করেন। বস্তুত যুক্তিবাদনির্ভর পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের কাছেই সমস্যাটি ছিল ব্যক্তিগত দাম্পত্য-জীবনে ভাববিনিময়ের অসম্পূর্ণতা বা ব্যর্থতার সমস্যা। এঁদের অধিকাংশের বিবাহ হয়েছিল কৈশোরে এবং অভিভাবকনির্দেশে। এদিকে নতুন শিক্ষার ফলে আহৃত নতুন বিশ্বাসের উদ্দীপনা ও পুরাতন প্রথা ভাঙ্গার আবেগের প্ররোচনায় এই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বিস্ফোরকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যশাসিত ও সংস্কারবদ্ধ পরিবেশে লালিত প্রায়-অশিক্ষিত স্ত্রীদের সঙ্গে এই তরুণ দলের অনেকের মানসিক সাযুজ্য ছিল না। সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ছাড়া জ্ঞানোপার্জিকা সভা কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। বস্তুত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বা স্টাডি সার্কল হিসাবেই সভাটি পরিগণিত হবার যোগ্য।[১১৫] কিন্তু তা সত্ত্বেও সেকালের সমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলি সম্বন্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং নারীর সামাজিক দুর্দশার কারণগুলির দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে জ্ঞানোপার্জিকা সভা নিশ্চিত এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

বাল্যবিবাহ যে বহু সামাজিক অকল্যাণের হেতু এই ধারণা ক্রমশ কিছু সংখ্যক মানুষের মনে সচেতন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে থাকে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল স্পেক্টেটরে 'কস্যচিৎ বন্ধোঃ' স্বাক্ষরিত একটি পত্রে বাল্যবিবাহের দোষ প্রকটিত করে এই প্রথা নিবারণের আহ্বান জানান হয়। বিদ্যাদর্শন পত্রিকাতেও 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের

ব্যভিচারের কারণ' পত্রের সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানান হয় যে কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির আগে তাকে বিবাহদান দম্পতির প্রণয়সুখের অন্তরায়।[১১৬] অতঃপর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলে সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্যে বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করেন এবং এই প্রথার বিরোধিতা করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার স্মৃতি তহবিলের পুরস্কারের জন্য বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্র ও 'জগবন্ধু'পত্রিকা সম্পাদক সীতানাথ ঘোষ পরের বছর ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারের পুরস্কারও লাভ করেন।[১১৭] সংবাদ প্রভাকরের কয়েক কিস্তিতে বাল্যবিবাহ-বিরোধী পত্র প্রকাশিত হয়।[১১৮]

পরবর্তী দশকে বাল্যবিবাহ বিরোধী আলোচনা ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুত বিবাহকেন্দ্রিক সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমাজে এই সময়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুতরাং বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ উচ্ছেদের জন্য যেমন একদিকে প্রচেষ্টা তীব্রতর হয়, তেমনি বাল্যবিবাহ নিবারণের প্রয়োজনীয়তা আরো অনুভূত হয়। এইসব "অশেষ দোষকারক কুৎসিত নিয়মগুলি নিরাকরণ করার" উদ্দেশ্যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বশুভকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং "সর্বশুভকরী" পত্রিকা নামে ঐ সভার মুখপত্রের প্রথম সংখ্যায় একটি প্রবন্ধের সাহায্যে বিদ্যাসাগর "বাল্যবিবাহের দোষ" প্রতিপাদন করেন। তাছাড়া বাল্যবিবাহের কুফলগুলি প্রদর্শন করে এই সময়ে কয়েকটি নাটকও রচিত হয়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত "সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি", ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সঙ্গত সভা এবং ব্রাহ্ম সমাজ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত সচেতন করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এছাড়া তত্ত্ববোধিনী, বামাবোধিনী, সোমপ্রকাশ ইত্যাদি পত্রিকাও বাল্যবিবাহবিরোধী রচনা প্রকাশ করে জনমত প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখে।

১৮৬০-এর সূচনা থেকে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে সমাজসংস্কার আন্দোলন বিশেষ গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে নানারকম মত এই সূত্রে উৎসাহের সঙ্গে প্রচারিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের ঢেউ পূর্ববঙ্গের ঢাকা,বরিশাল শহরে পৌছায় এবং অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। ঢাকার যুবক পার্বতীচরণ গুপ্ত বিধবা কামিনীকে বিবাহ করে একাধিক সামাজিক প্রথা ভঙ্গ করেন। এটি ছিল একাধারে বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ। উপরন্তু পাত্রের পঁচিশ ও কন্যার সতেরো বছর বয়সের হেতু "উপযুক্ত বয়সে বিবাহের প্রথা প্রবর্তিত ও দ্রঢ়িষ্ঠ হইল"।[১১৯] বস্তুত ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহের সমর্থনে প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ শতাধিক প্রগতিপন্থী ব্যক্তি সরকারের নিকট যে একটি সাধারণ বিবাহবিধি প্রবর্তনের দাবি জানান তাতে তেমনি বাল্যবিবাহ নিবারণের দাবি ও জানান হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে ঢাকায় 'বাল্যবিবাহনিবারণী সভা' স্থাপিত হয়। ঢাকা কলেজের

অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। কিছুদিন পরে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ঐ সভা 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকা' বাল্যবিবাহকে দেশের উন্নতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে বর্ণনা করে।[১২০] এই সমস্ত আন্দোলন সমাজে বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য সক্রিয় প্রয়াস চালান কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৭১খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র Social Reform Association নামে এক সভা স্থাপন করেন এবং এই সভার সভাপতি হিসাবে নারীর সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স নির্ধারণ করবার জন্য মত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১ এপ্রিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন খ্যাতনামা চিকিৎসকের কাছে একটি মুদ্রিত সার্কুলার প্রেরণ করেন। এই সার্কুলারের উত্তরে বিভিন্ন চিকিৎসকের মত ছিল নিম্নোক্তরূপ ঃ-[১২১]

নাম	সর্বনিম্ন বয়স	উপযুক্ত বয়স
ডাঃ চন্দ্র কুমার দে	১৪	—
ডাঃ টি.ই.চার্লস	১৪	—
বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু	১৫	১৮
ডাঃ এ.ভি. হোয়াইট	১৫-১৬	—
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার	১৬	১৮
ডাঃ তমিজ খান বাহাদুর	১৬	—
ডাঃ নর্মান চেভার্স	১৬	—
ডাঃ ডি.বি. স্মিথ	১৬	১৮-১৯
ডাঃ জে. এওয়ার্ট	১৬	১৮-১৯
ডাঃ জে. ফেরার	১৬	১৮-২০
ডাঃ সূর্য কুমার গুডিভ চক্রবর্তী	১৬	২১
ডাঃ আত্মারাম পান্ডুরং	২০	—

এর আগে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেন যে কন্যা ঋতুমতী হওয়ার অন্তত দুইবছর পর বিবাহ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ চিকিৎসকগণ শারীরিক কারণেই বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার উপরন্তু মন্তব্য করেন যে "বাল্যবিবাহ আমাদের দেশের সর্বাধিক অনিষ্টকর কুপ্রথা। এই প্রথা জাতির স্বাভাবিক বিকাশের পথকে জীবনের প্রস্ফুটকালেই রুদ্ধ করে রেখেছে"।[১২২]

কিন্তু চিকিৎসকদের মত যতই বাল্যবিবাহবিরোধী হোকনা কেন জনমত তখনোব্যাপকভাবে বাল্যবিবাহের অনুকূলে ছিল। লোকবাধা যাতে বেশি না হয় সেজন্য চিকিৎসকদের প্রদত্ত বয়সের মধ্যে থেকে নিম্নতমটিকে (অর্থাৎ ১৪ বছর) গ্রহণ করে কেশবচন্দ্র আইন প্রবর্তনের জন্য উদ্‌যোগী হন। কয়েক বছর ধরেই তিনি আইনের মারফৎ বিবাহসংস্কারের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে অনেক বিতর্ক ও সংশোধনীর পর ভারত সরকার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ বিবাহ বা তিন আইন পাস করেন। এই আইন

অনুসারে বিবাহে কন্যার নিম্নতম বয়স চোদ্দ ও পাত্রের আঠারো নির্দিষ্ট হয়।

এই তিন আইন বা বিশেষ বিবাহ বিধি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সন্দেহ নেই, কিন্তু আইনটি সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশে প্রযোজ্য ছিল। কারণ, শুধুমাত্র প্রচলিত প্রধান ধর্মসম্প্রদায় সমূহ বহির্ভূত মানুষ এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন। বিবাহের প্রতিজ্ঞা-বিধি অনুযায়ী বিবাহকারীকে ঘোষণা করতে হত যে তিনি প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি প্রভৃতি কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না এবং ঐসব ধর্মের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ বিবাহ বিধি অনুযায়ী শুধু বাল্যবিবাহ অবৈধ বলে ঘোষিত হয় না, এই আইনের দ্বারা বহুবিবাহকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়, বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃতিলাভ করে এবং বিবাহ অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে মুক্ত হয়। এই আইনের শর্তগুলি পর্যালোচনা করলে এটিকে একটি আধুনিক ও সেকুলার বিবাহ ব্যবস্থা বলে দ্বিধাহীনভাবে পরিগণিত করা যায়।[১২৩]

আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ , বিশেষত রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আইনের ঘোর বিরোধী ছিলেন, প্রধানত এই কারণে যে এই আইন অনুযায়ী বিবাহকারী ব্রাহ্মকে 'আমি হিন্দু নই' ঘোষণা করতে হবে। তাছাড়া এই নিরীশ্বরবিবাহ বিবাহরূপ-ধর্মানুষ্ঠানের বৈধতার জন্য সিভিল অনুষ্ঠানের প্রবর্তন এবং বিবাহরূপ পবিত্র প্রথার উপর সরকারী হস্তক্ষেপ— সবই প্রজাদের চিরাচরিত ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। অধিকন্তু সরকারকে স্বেচ্ছায় এই কার্যে প্রণোদিত করেছে স্বয়ং প্রজারাই। পূর্বের দুটি আইন— সতীপ্রথা উচ্ছেদকারী এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনকারী— কোন ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। রাজনারায়ণ বসু বলেন "সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সম্মুখে যে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি , যাহার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই অথাৎ রেজিস্ট্রার, বলেন ঐ বিবাহ বৈধ। ধার্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারিনা"।[১২৪]

কিন্তু বৃহত্তর হিন্দু সমাজ এই আইন বিষয়ে উদাসীন ছিল,কারণ এই আইন তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও সমাজের অধিকাংশ মানুষ এবং বহু শিক্ষিত মানুষ নানা কারণে বাল্যবিবাহের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। বাল্যবিবাহের ফলে দীর্ঘদিন একত্রবাসের দরুণ দম্পতির মধ্যে প্রণয় জন্মে, বাল্যবিবাহ হলে ব্যভিচার ঘটেনা। এছাড়াও যুক্তি ছিল "বয়োধিক্যদিগের বিবাহটা যেন কেমন দেখায়"।[১২৫] সুতরাং বাল্যবিবাহ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক বি.এম.মালাবারি

বাল্যবিবাহ ও বিধবাসমস্যা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করেন। ফলে বাল্যবিবাহের কুফলগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা জাগ্রত হয় ও সরকারও সমস্যাগুলি বিষয়ে সম্যক অবহিত হন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা এবিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক হরিমোহন মাইতি তার এগার বছরের বালিকা স্ত্রী ফুলমনির সঙ্গে বলপূর্বক সহবাস করলে মেয়েটির মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বাল্যবিবাহবিরোধীগণ এই সূত্রে আন্দোলন তীব্রতর করে তোলেন। কলকাতা Health Society এবং পঞ্চান্নজন মহিলা ডাক্তার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।[১২৬]

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এইসব প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় এক প্রতিবাদ সভায় জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ প্রবল প্রতিবাদ করেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত পরবর্তী আর এক প্রতিবাদ সভায় বহু মুসলিম জমিদার ও আইনজীবী তীব্র প্রতিবাদ করে জানান এর ফলে সুযোগসন্ধানীরা মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করবে। এদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রগতিবাদী ব্যক্তিগণ জনসমর্থনলাভের চেষ্টা করতে থাকেন। পূর্ববাংলার মুসলিমদের একটা বড় অংশ নবাব আহসানউল্লার নেতৃত্বে বাল্যবিবাহবিরোধী আইনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১২৭]

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সোশ্যাল কনফারেন্সের চতুর্থ বার্ষিক সভায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতির অভিভাষণে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করেন। এই সভা বাল্যবিবাহবিরোধী প্রবল জনমত গড়ে তোলার জন্য বিবিধ আয়াসসাধ্য প্রয়াস অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অবশেষে প্রধানত মালাবারির চেষ্টায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ মার্চ সহবাস সম্মতি আইন প্রণীত হয়। এই আইন অনুসারে বারো বছরের কম বয়সের মেয়েদের সঙ্গে সহবাস স্বামীর পক্ষে দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই আইনের বিরুদ্ধে পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও অন্যান্য রক্ষণশীল নেতাদের উদ্যোগে কলকাতায় যে সব বড় বড় সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে অধিকাংশের মত আইনটির বিরুদ্ধে ছিল। পূর্ববঙ্গে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ এই আইনটিকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে ওঠে। সতী প্রথা বিলোপের পর আর কোন বিষয় নিয়ে এত তর্ক বিতর্ক বা আন্দোলন হয়নি।[১২৮]আইনটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল এই যে অর্থনৈতিক কারণে বাল্যবিবাহ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে, সহবাস সম্মতির বয়স স্থির করবার প্রয়োজন নেই।[১২৯] সহবাস সম্মতি বিল-এর প্রস্তাব বিদ্যাসাগরের কাছে ত্রুটিপূর্ণ বোধ হয়েছিল। তাঁর প্রস্তাব ছিল কন্যা ঋতুমতী হবার আগে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ করা হোক। কারণ, ঋতুর সূচনাকালের নির্দিষ্ট বয়স নেই এবং কন্যাভেদে তার অগ্রপশ্চাৎ ঘটে। তাই সহবাসের ক্ষেত্রে বারো বছরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া অনুচিত, এতে কন্যার স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না, কারণ অধিকাংশ মেয়ে বারো বছরের পরে প্রথম ঋতুমতী হয়। বিদ্যাসাগরের ধারণা ছিল প্রস্তাবিত বিলটির তুলনায় তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ব্যাপকতর ও অধিকতর বাস্তব স্বার্থ রক্ষিত হবে। তাছাড়া এই ব্যবস্থা

গ্রহণ করলে ধর্মীয় লোকাচারে হস্তক্ষেপের অভিযোগও উঠবে না। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেন ঋতু আরম্ভ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দন্ডনীয় হোক।[১৩০]

বাল্যবিবাহবিরোধীগণ নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এই প্রথাকে নিরুৎসাহ করার প্রস্তাব দেন। বাল্যবিবাহকারী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার অনুমতি না দেওয়া কিংবা সরকারী চাকরিতে বিবাহিতের পরিবর্তে অবিবাহিত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি প্রস্তাবগুলি সরকারকে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধরণের কঠোর প্রস্তাব গ্রহণে সরকার সম্মত হন না।[১৩১]

এদিকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত নতুন বিবাহরীতিকে আইনসম্মত স্বীকৃতিদান করে। উপরন্তু এই আইনে কন্যা সম্প্রদানের পরিবর্তে পাত্র ও কন্যার সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিবাহ প্রতিজ্ঞা প্রবর্তিত হয়। সমকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনটি অতি অগ্রসর মনে হলেও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কিছু ব্রাহ্ম যুবকের কাছে আইনটি যথেষ্ট প্রগতিশীল বিবেচিত হয়নি। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুসহ এই দলভুক্ত সকলে প্রতিজ্ঞা করেন যে পুরুষের একুশ এবং কন্যার ষোল বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কেউ বিবাহ দেবেন না বা সেই বিবাহে পৌরোহিত্য করবেন না।[১৩২]

সমাজের সর্বস্তরে তৎকালীন বিচারে এই অতি অগ্রসর বাল্যবিবাহবিরোধী কর্মপ্রণালীর ব্যাপক প্রভাব কিন্তু সহজে অনুভূত হয়না। ঊনবিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতেও বাল্যবিবাহ প্রথার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য প্রথাটি ক্রমে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে এবং কন্যার বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজের অন্যত্রও এই প্রবণতার প্রভাব কিছু পরিমাণে অনুভূত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জনগণনার হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় পুরুষদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে অর্ধেকের সামান্য বেশী অবিবাহিত ও মোট নারীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অবিবাহিত। দশ থেকে পনেরো বছর বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ নারীর অনুপাত ৩:১। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুপাত ছিল প্রায় ২:১।[১৩৩]

মুসলিম সমাজেও বাল্যবিবাহ বিরোধী মত প্রকাশ করে সমাজসচেতনতা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার সাবডেপুটি নওশের আলি খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪)বঙ্গীয় মুসলমান গ্রন্থে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী(১৮৭৪-১৯৫০) নারীজাগরণের জন্য সমাজকে সচেতন করতে প্রয়াসী হন এবং অন্যান্য কুপ্রথার সঙ্গে বাল্যবিবাহরূপ অনিষ্টকারক প্রথাকে সামাজিক শাসনদ্বারা উচ্ছেদ করার কথা বলেন। ইংরেজিশিক্ষিত নব্য মুসলিম সমাজের অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলমান মেয়েদের উন্নতির জন্য বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বস্তুত মুসলিম সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিবাহিত জীবনের সুখ ও মানসিক শান্তির জন্য নারীর সকল প্রকার অগ্রগতি যে প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে থাকেন।[১৩৪]

তবে হিন্দু সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে বাংলার অমুসলমান শ্রেণীর মধ্যে নারী উন্নয়ন বিষয়ে যে অপেক্ষাকৃত অধিক সচেতনতা দেখা যায়, নানা কারণে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে তার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

' তাহারে উঠাই যদি হাতে ধরে
ধূলি পঙ্ক হতে
আপনি উঠিব মোরা, জয়ধ্বনি উঠিবে জগতে'--

সৈয়দ এমদাদ আলীর কবিতার এই সচেতনতা মুসলমান সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[১৩৫] বৃহত্তর সমাজের জাগরণের জন্য তাঁদের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

(ঙ)

স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন

বিধবা সমস্যা কিংবা কুলীন প্রথাজনিত বহুবিবাহ সমস্যা— এই গুলি ছিল উচ্চবর্ণের নারী সমস্যা। নিম্নবর্গীয় সাধারণ মেয়েদের জীবনে দুঃখ দারিদ্র্যের পীড়ন থাকলেও এই সমস্যাগুলি ছিল না। কোনো তাত্ত্বিক পবিত্রতার ধারণা কিংবা কাল্পনিক বংশমর্যাদার আদর্শ তাদের জীবনকে অসহায় ও নিষ্ঠুরভাবে পঙ্গু করে রাখেনি। কিন্তু শিক্ষাহীনতার সমস্যা ছিল সমাজের সর্বশ্রেণীর নারীর। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রায় অপ্রচলিত হয়ে যায়। এদেশে বাল্যবিবাহশাসিত এবং অন্তঃপুরবদ্ধ নারীর জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল অননুভূত এবং সুযোগও ছিল দুর্লভ। নিম্নবর্ণের মেয়েদের জীবন অনেকটাই অবরোধমুক্ত ছিল, কিন্তু বাল্যবিবাহের প্রতাপ সর্বত্র প্রবল ছিল এবং গায়ে গতরে খাটা মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আদৌ আবশ্যকতা আছে বলে কেউ মনে করত না। তাছাড়া সুযোগ বা সময়ও অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য ছিল।

কিন্তু ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার কথা আছে। প্রাচীন সাহিত্যেও এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে। পণ্ডিত দুহিতা লাভ করবার জন্য করণীয় সম্বন্ধে উপনিষদে ব্যবস্থা আছে। উপরন্তু বিবাহে কন্যা সম্বন্ধে পুরুষের পাঁচটি কাম্যবস্তুর যে তালিকা আছে, অর্থাৎ ধন, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বংশ[১৩৬] তাতেও স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে এদেশের নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমশ হরণ করা হয় ও বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হয়। বাল্যবিবাহের ফলে স্বভাবতই শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়। কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারে নারীর উচ্চশিক্ষা অল্প পরিমাণে প্রচলিত থাকলেও সাধারণ ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া প্রাথমিক স্তরেই রয়ে যায়। মধ্যযুগেরচিত মঙ্গলকাব্যগুলি, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ময়নামতী ও মানিকচাঁদের গান ইত্যাদিতে সমাজজীবনের যে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত.

তাতে দেখা যায় ছেলে মেয়েরা এক পাঠশালায় লেখাপড়া করে, মেয়েরা নানাবিষয়ে শিক্ষিত হয়, এমনকি শরীরচর্চা পর্যন্ত করে। নিম্নবর্গীয় মেয়েরাও— ব্যাধনারী ফুল্লরা, খুল্লনা, বিপুলা, রাজদেবী— যথেষ্ট শিক্ষিত, এমনকি হিন্দু শাস্ত্রাদিও তাঁদের ভালই জানা আছে। উচ্চশিক্ষিত, মননশীল, কিংবা সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী কবিমনের নারীও এযুগে দুর্লভ নয়। চণ্ডীদাস প্রেমিকা রামী কবিতা রচনা করেন, চৈতন্য-অনুগামী উচ্চশিক্ষিত মাধবীও অনেক সুন্দর কবিতা রচনা করেন। বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী উচ্চশিক্ষিত এবং রামায়ণ রচয়িতা। আবহাওয়া,কৃষি ও জ্যোতিষজ্ঞানের বিস্ময়কর নিদর্শন স্থাপন করেন খনা।[১৩৭] কিন্তু ক্রমে অবরোধপ্রথা ও বাল্যবিবাহের চাপে মেয়েদের লেখাপড়াশেখা বা চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধপ্রথার অনুপস্থিতিতে এবং অনেক পরিমাণে সামাজিক স্বাধীনতা থাকায় বৈষ্ণব মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন অব্যাহত থাকলেও অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সাধারণ গৃহস্থ হিন্দু মেয়ের প্রায়-নিরক্ষরতা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

শিক্ষাহীন নারীসমাজের এই অন্ধকার চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কদাচিৎ দু'একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারী ডব্লু. ওয়ার্ড লিখিত একটি বিবরণে কাশীতে অধ্যাপনারত বিদুষী হটী বিদ্যালঙ্কারের খ্যাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপ বিদুষী ও বিদ্যাদানে নিযুক্ত জনৈক অব্রাহ্মণ রূপমঞ্জরীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১৩৮] তাছাড়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার চর্চা ছিল। চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পর থেকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের স্ত্রী এবং কন্যাগণকে অগণিত স্ত্রীভক্তের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও ব্যাখ্যাকর্তার ভূমিকায় দেখা যায় এবং তখন থেকেই বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার এক বলিষ্ঠ অব্যাহত ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রচলিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও শান্তিপুর ও নদীয়াতে শিক্ষিত বৈষ্ণবীর সংখ্যা অল্প ছিল না। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত বৈষ্ণবী খেপীর মূল্যবান বৈষ্ণবসাহিত্যের নিজস্ব এক বৃহৎ সংগ্রহ ছিল যা তিনি নিয়মিত ব্যবহার করতেন। সন্ধ্যাবেলায় নারী ও শিশুর এক বৃহৎ সমাবেশে তিনি নিয়মিত শাস্ত্রব্যাখ্যাও করতেন। বস্তুত ধর্মচর্চার জন্যও অন্তত বৈষ্ণব পিতা কন্যাকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন।[১৩৯]

পক্ষান্তরে সম্ভ্রান্তহিন্দু ঘরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল সম্পূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত কারণে। রাণী ভবানী এবিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাতৃভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে দেখা যায় কোনো কোনো জমিদার পিতা কন্যাদের সাধারণ শিক্ষা এবং জমিদারি হিসাবরক্ষার কার্যে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে তৎপর ছিলেন। ভবিষ্যতে কন্যার সম্ভ্রান্ত বংশে জমিদারগৃহে বিবাহের সম্ভাবনা এবং স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সম্পত্তিরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তাঁরা এই কার্যে প্রবৃত্ত হতেন। কলকাতার কতগুলি বিশিষ্ট পরিবারেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। শোভাবাজার রাজপরিবার, পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর

'আধ্যাত্মিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে বাল্যকালে পাঠশালায় পড়ার সময় (তাঁর জন্ম ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি বাড়িতে পিতামহী, মাতা ও অন্যান্য মাতৃস্থানীয় আত্মীয়দের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা দেখেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মা লেখাপড়া জানতেন এবং মজিলপুরে গ্রামের স্কুলে পড়ার সময় শিবনাথকে নিয়মিত পড়া বলে দিতেন। আর একশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে তখন শিক্ষার আগ্রহ দেখা যেত। কিছু সন্তানহীন বয়স্ক বিধবা সন্তানশোক থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে ধর্মগ্রন্থ পড়বার জন্য লেখাপড়া শিখতেন।[১৪০] স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক (গৌরমোহন তর্কালঙ্কার রচিত) গ্রন্থ থেকে জানা যায় শোভাবাজার রাজপরিবারের মহিলারা প্রায় সবাই লেখাপড়া জানতেন।

উপরোক্ত বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা অপ্রচলিত ছিল। এর ফলে ক্রমে হিন্দুদের মধ্যে এমন সংস্কারের জন্ম হয় যে মনে করা হতে থাকে কোনো মেয়ে লেখাপড়া জানলে সে বিধবা হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক কুসংস্কার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত ছিল। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সমাজে ও সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং ব্যভিচারের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধিপাবে এই রকম বদ্ধমূল ধারণা নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল।[১৪১] বস্তুত শিক্ষার অধিকারবঞ্চিত ও বাল্যবিবাহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সময়ের মেয়েদের মধ্যে স্বভাবতই পুরুষদের প্রতি দাসত্বের মনোভাবের জন্ম দেয়।[১৪২]

মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সমাজ অনুভব করেনি এবং ক্রমে বিশ্বাস করেছে যে নারীজাতি বুদ্ধিহীন, সুতরাং তাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রথম দৃপ্ত প্রতিবাদ করেন রামমোহন রায়। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, "স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" তিনি কঠোর ভাষায় বলেন একজন নারী একাধারে রাঁধুনী, শয্যাসঙ্গিনী ও বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী মাত্র। "সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে"।[১৪৩]

কিন্তু নারীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন মিশনারীগণ। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত নতুন সনদ অনুযায়ী মিশনারীরা এদেশে অবাধ গতিবিধির অধিকার লাভ করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রবার্ট মে চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন।[১৪৪] এরপর ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের স্ত্রীদের উদ্যোগে কলকাতায় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সোসাইটি জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলাভাষায় মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মে-জুনে প্রথমে গৌরীবাড়িতে পরে বিভিন্ন স্থানে আরো তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। প্রথম বছরে প্রথম বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮। দ্বিতীয় বর্ষে দেশীয় শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেলে ছাত্রী সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপায় এবং ১৪ ডিসেম্বর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সোসাইটির দ্বিতীয় বর্ষিক বিবরণীতে জানা যায় ছাত্রীসংখ্যা তখন বত্রিশ। অন্য বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রীসংখ্যা

দাঁড়ায় ৭৯। ১৮২১-২২ খ্রীস্টাব্দে স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের সঙ্গে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীরাও পরীক্ষা দেয় এবং প্রশংসালাভ করে। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় চল্লিশজন ছাত্রী উপস্থিত ছিল। জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয় সংখ্যা ক্রমে কুড়িটিতে পৌঁছায়। কলকাতা এবং কলকাতার উপকণ্ঠে ছাড়া কাটোয়া এবং বীরভূমেও সোসাইটির কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে ছাত্রীসংখ্যা ও স্কুলের সংখ্যা কমতে থাকে।[১৪৫]

ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি নামে বিলাতের খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহযোগিতায় এবং শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়াম ওয়ার্ডের অনুপ্রেরণায় তরুণী মিস মেরী অ্যান কুক এদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্কল্প গ্রহণ করে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। মিস কুক কলকাতায় পৌঁছে চার্চ মিশনারী সোসাইটিতে যোগদান করেন। এই সোসাইটির সাহায্যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চব্বিশটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লেডী আমহার্স্টের পৃষ্ঠপোষণায় ২৫ মার্চ লেডীজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন স্থাপিত হয় এবং এই সভার উপর মিস কুক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির পরিচালনাভার অর্পিত হয়।[১৪৬] সোসাইটির একজন উৎসাহী অনুরাগী ছিলেন ডেভিড হেয়ার এবং স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি আগ্রহের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ত্রিশ। এইসব বিদ্যালয়ে সাধারণত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মেয়ে অথবা বেশ্যাকন্যারা পড়তে যেত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক পুরস্কারের লোভে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সব বিদ্যালয় গুটিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অর্থ সাহায্য দেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়। শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নতুন শ্রেণী খোলা হয়। তরুণী বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলারা ছিলেন এই নতুন শ্রেণীর ছাত্রী। এই শ্রেণীটিতেই পরে স্ত্রী নর্মাল স্কুলের সূচনা হয়। বর্ধমানেও কয়েকটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪৭]

কিন্তু বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তনের কোনো সম্বন্ধ ছিলনা। স্বয়ং রামমোহন শিক্ষাহীন নারীর দুর্দশায় বিচলিত হয়ে কঠোর মন্তব্য করলেও এই বিষয়ে কোনো আন্দোলন করেননি বা কোনো আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেননি। স্কুল সোসাইটির সম্পাদকরূপে রাধাকান্ত দেব স্পষ্টই জানান যে কোনো ভদ্র হিন্দু পরিবার মিস কুকের স্কুলে মেয়ে পাঠাবে না। প্রধান বাধা ছিল খ্রীষ্টান ধর্মশিক্ষার ভয় এবং নীচজাতি ও বেশ্যা-কন্যাদের সঙ্গে একত্রে লেখাপড়া করা। এছাড়াও অবরোধ প্রথা ভেঙ্গে বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাবার চিন্তাও তাঁদের কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হত না। মিশনারীদের নারী শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসের প্রত্যক্ষফল অতএব খুব আশাপ্রদ নয়। কিন্তু পরোক্ষে এই প্রয়াস শিক্ষিত মানুষের মনে সচেতনতা সৃষ্টি করে। মিশনারী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে নিয়মিত উপস্থিত থেকে হিন্দুপ্রধানগণ মিশনারীদের উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তোলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাব প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতার উন্মেষ হতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দু

সমাজের নেতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক (১৮১৮ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ও কলকাতা স্কুল সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদকরূপে(১৮১৮) তিনি এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রবর্তন ও বিস্তারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রবর্তনায় স্কুল বুক সোসাইটি ও হেয়ার স্কুলের পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নারীশিক্ষার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। রাধাকান্ত উক্ত পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পর্দা ভেঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠাতে রাজি ছিলেন না। বাঙালির পারিবারিক আদর্শ বজায় রেখে মেয়েরা যাতে অন্তঃপুরেই শিক্ষালাভ করতে পারে এই ছিল তাঁর আদর্শ।[১৪৮]

কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে অন্তঃপুরে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বৈষ্ণবী ও মিশনারী মহিলাদের সাহায্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ত্রী ও কন্যাগণ শিক্ষিত হতে থাকেন। শিবচন্দ্র রায়, আশুতোষ দেব, চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্ব স্ব কন্যাদের গৃহাভ্যন্তরেই শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেন, কেউ নিজেই কন্যাকে পড়ান। কৈলাসবাসিনী দেবী ও কুমুদিনী দেবী নিজ নিজ স্বামীর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন।[১৪৯] জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রথমে বৈষ্ণবী পরে মিশনারী মহিলাদের সাহায্যে অন্তঃপুর শিক্ষার বন্দোবস্তের কথা জানা যায়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামীর কাছে লেখাপড়া শেখেন। নিস্তারিনী দেবী বলেন,"বউকে একটু পড়িয়ে দিয়ে ছেলেকে পড়াতে বললে সহজেই বউয়ের শিক্ষা হয়.....ছেলের মা আপনিই যা পড়াতে হবে সব শিখে নেয় ছেলেকেও প্রাণপণে শেখায়"।[১৫০] কিন্তু এই সবই বিচ্ছিন্ন চিত্র মাত্র। অ্যাডাম সাহেব বাংলাদেশের সর্বত্র পরিদর্শন করে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে নারী শিক্ষার শোচনীয় দুরবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া পিতা, কিংবা স্বামীর কাছে কিংবা বৈষ্ণবী অথবা মিশনারীর সাহায্যে অন্তঃপুর শিক্ষার যে সুযোগ কিছু কিছু মহিলা লাভ করেন তারও উদ্দেশ্য ছিল ভাল জননী কিংবা সঙ্গিনী তৈরী করা এবং পরিবারের সনাতন আদর্শ অব্যাহত রাখা।[১৫১]

ইতিমধ্যে নারীশিক্ষার স্বপক্ষে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী উচ্চকণ্ঠে মত প্রকাশ করতে শুরু করেন। ইতিপূর্বে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা পার্থেনন পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। ডিরোজিওশিষ্য ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, বেন্থামের উপযোগবাদ এবং শেলী ও বায়রনের রোমান্টিক বিদ্রোহের আদর্শের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ঐতিহ্যাশ্রিত হিন্দুধর্মের তীব্র বিরোধী এই গোষ্ঠী চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমস্ত কিছুকে যুক্তিবাদের সাহায্যে যাচাই করবার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং নারীশিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কুসংস্কারচ্ছন্ন মনোভাবকে এঁরা কঠোরভাবে আক্রমণ করতে থাকেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায়' পঠিত প্রবন্ধে মহেশচন্দ্রদেব স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে দ্বিধাহীন বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেন।[১৫২] ইয়ং বেঙ্গল দলের

মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে দৃঢ়মত ব্যক্ত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদানের জন্য রামগোপাল ঘোষ উক্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দুই প্রবন্ধরচনাকারীর জন্য ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক ঘোষণা করেন এবং মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে পুরস্কারদুটি লাভ করেন।[১৫৩]

কিন্তু সমাজসংস্কারের বিভিন্ন বিষয়ে মতের উগ্রতা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী নানাকারণে কখনো এই গুলিকে স্থায়ী আন্দোলনের রূপদান করতে পারেনি। অথচ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রবল দাবির পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। যে পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও শিক্ষা বা Enlightenment দ্বারা তাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন তার মূল কথা হল 'ব্যক্তি' হিসাবে মানুষের মূল্য সম্বন্ধে সম্মানবোধ। এই তাত্ত্বিক দিক ছাড়া ব্যক্তিগত কারণও বিদ্যমান ছিল। ডিরোজিও শিষ্যরা ছিলেন প্রথম প্রজন্মের সমাজ-সংস্কারক গোষ্ঠী। তাঁদের অধিকাংশের বিবাহ হয়েছিল কৈশোরে এবং অভিভাবক মনোনীত কন্যার সঙ্গে। নব্যবঙ্গের প্রবক্তাগণ যে নতুন চিন্তাদর্শ ও ব্যক্তিগত অভ্যাসে জীবনগঠন করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁদের অভিভাবক ও স্ত্রীদের মানসিক সাযুজ্যের দুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে ওঠে। অথচ নতুন ভাবাদর্শগত মত ও তদনুরূপ আচরণপালনে এঁরা অতি উগ্র হয়ে উঠেছিলেন বলে অনেকেই মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই সংঘাতময় পরিবেশে অন্তত স্ত্রীর মানসিক সাহচর্যের প্রয়োজন তাঁরা বেশি করে অনুভব করেন।[১৫৪] খানিকটা অন্তত শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত স্ত্রীর জন্য আকাঙ্ক্ষা আসলে তাঁদের নিজেদেরই জীবনের প্রয়োজনে, দাম্পত্য তৃপ্তির প্রয়োজনে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়োজনেও।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন জেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁর মৃত্যুদিনে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হত। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনে ও সমাজে এই সম্বন্ধে অনুকূল মত গড়ে তুলবার জন্য ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড' খোলা হয়। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকরা এই ফাণ্ডের অর্থভাণ্ডার থেকে পুরস্কৃত হতেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ফাণ্ড পুরস্কার প্রদান প্রথা রহিত করে এবং উক্ত ভাণ্ডার থেকে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করে। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্রদেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ফাণ্ডের পরিচালক।[১৫৫]

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্যগণের চেষ্টায় সমাজ সংস্কার, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্থাপিত 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদসমিতি'র অনেকগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল স্ত্রীশিক্ষা। অক্ষয়কুমার দত্তের "মানবের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধবিচার" অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধগুলি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গ্রন্থটিতে নারীজাতির বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগ করা হয়।

এই গ্রন্থটি বিভিন্ন স্থানে, এমনকি সুদূর মফস্বলেও ছাত্রমহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভা'র মুখপত্র 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্ধ রচনা করে বিষয়টির যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টমাস থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের সম্পাদনায় স্ত্রীপাঠ্য সহজ পত্রিকা 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়।[১৫৬] ১৮৪৫ খ্রীষ্টব্দে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শিক্ষা কাউন্সিলের কাছে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যের আবেদন জানান। পরে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা উক্ত কাজের জন্য একটি পরিকল্পনাও পেশ করেন। ইতিমধ্যে প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের মেয়েদের জন্য বারাসতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু এজন্য প্রতিষ্ঠাতাদের যথেষ্ট সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়।[১৫৭]

বস্তুত স্ত্রীশিক্ষা পন্থী ও স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী দুটি বিপরীত ধারাই তখন সমাজে প্রবল শক্তিশালী ছিল। সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাদী উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডা দেখা যায়। সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এবং সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদপ্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র বাদানুবাদ করে। এমনকি হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ নারীজাতির বিদ্যাশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করেন।

নারীশিক্ষা সমর্থনকারী গ্রন্থপ্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশকেও অব্যাহত থাকে। তারাশঙ্কর তর্করত্ন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' রচনা করেন। দ্বারকানাথ রায় রচিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধান' গ্রন্থটি এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধেপ্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধার্থ সংগ্রহের অক্টোবর নভেম্বর সংখ্যায় সমালোচিত হয়। সভাসমিতিতে বক্তৃতাদান, প্রবন্ধরচনা বা গ্রন্থ প্রকাশ কিংবা সংবাদপত্রে তর্কবিতর্ক ইত্যাদির সাহায্যে এই ভাবে দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীশিক্ষাপন্থীরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকেন। এইসময়ে জে.ই.ডি. বেথুন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল স্থাপন করে এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে নতুন যুগের সূত্রপাত করেন। বিদ্যালয়টির লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয় ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদার শিক্ষাপ্রবর্তনের নীতি।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে বেথুন এদেশে বড়লাটের আইন সচিব হিসাবে আসেন এবং পদাধিকারবলে তিনি শিক্ষাকাউন্সিলের সভাপতি হন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে তিনি পূর্বেই আগ্রহী ছিলেন। অনুরূপ মতাবলম্বী রামগোপাল ঘোষ ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষা কাউন্সিলের সদস্য হন। রামগোপাল ঘোষের কাছে বেথুন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদন মোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তিগণের সক্রিয় সহযোগিতায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয় । বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য দক্ষিণারঞ্জন জমি ও এক হাজার টাকা এবং বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য পাঁচহাজার টাকার পুস্তক দান করেন। বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়টির সম্পাদকের ভার গ্রহণ

করেন (১৮৫০-১৮৬৯)। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ছিলেন পরিচালক সমিতির সভাপতি। বিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক এবং বইপত্রও বিনামূল্যে দেওয়া হত। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বেথুন নিজে বহন করতেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিদ্যালয়কে দান করেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ও তাঁর স্ত্রী লেডী ডালহৌসী বিদ্যালয়টির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বেথুনের আকস্মিক মৃত্যুর পরে ডালহৌসি স্বয়ং বিদ্যালয়টির ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন এবং তাঁর সুপারিশে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ভারত ত্যাগের পর সরকার বিদ্যালয়টির ব্যয়ভার পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুস্তকপাঠ, হাতের লেখা, পাটিগণিত, পদার্থজ্ঞান, বাংলার ইতিহাস, ভূগোল, সূচীকর্ম,এই গুলি ছিল পাঠ্য বিষয়। শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলাভাষা তবে কেউ কেউ ইংরাজীও শিখত। । যেসব ছাত্রী নিজস্ব যানবাহন ব্যবহার করত না তাদের যাতায়াতের জন্য বিদ্যালয় গাড়ি ও পাল্কির ব্যবস্থা করত।[১৫৮] প্রথমে একুশ জন ছাত্রী নিয়ে কাজ শুরু হলেও রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধতায় শীঘ্রই ছাত্রীসংখ্যা কমে সাত জনে দাঁড়ায়। কিন্তু বিরোধিতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। প্রথম বছরের শেষে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় চৌত্রিশ। রাজা রাধাকান্ত দেব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এইরকম মহোপকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিন্দাচর্চাকে ধিক্কার দেন। যে একুশজন মেয়ে নিয়ে বিদ্যালয়টির সূচনাহয় তাদের মধ্যে দুজন -- ভুবনমালা ও কুন্দমালা -- ছিলেন মদনমোহনের কন্যা। ক্রমে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনীকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এই সময় আশিতে দাঁড়ায়। বেথুন-বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করে ভদ্রলোক হিন্দু পরিবার প্রথম অবরোধ ভঙ্গ করলেন এবং স্ত্রীশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন।[১৫৯]

বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসময়ে রাধাকান্ত নিজ গৃহেও স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। উত্তরপাড়া, নিবধুই, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু সরকার থেকে কোনো বিদ্যালয়কে সাহায্য দান করা হয়নি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষাকে উৎসাহদানের কথা সরকার স্বীকার করেন। সেই অনুসারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব এই বিষয়ে আগ্রহী হন এবং তদনুসারে বিদ্যাসাগর হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাতে প্রায় পঁয়ত্রিশটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে সরকার অর্থসাহায্য বন্ধ করায় বিদ্যালয়গুলি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর ভিতরে সংস্কারকদের আকাঙ্ক্ষা ও তার পূরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দুরূহতা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

বেথুন বিদ্যালয়ের অবস্থাও ক্রমে খারাপ হতে থাকে। ছাত্রীসংখ্যা হ্রাস পায় ও শিক্ষার মানের অবনতি হয়। অবরোধপ্রথা, বাল্যবিবাহ এবং সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর উদাসীনতা প্রধানত এই তিনটি কারণে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা পরপুরুষের সঙ্গে পত্রমারফৎ যোগাযোগ করবে, গৃহকর্মে অবহেলা করবে

অথবা স্বামীর অবাধ্য হবে— এই রকম বহু আশঙ্কায় মানুষ স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূলতা করতে থাকে।[১৬০] কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নারী উন্নয়ন প্রয়াস যখন থেকে একটা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে তখন স্ত্রীশিক্ষাপ্রসঙ্গটি সেই আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের স্বপক্ষে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কার্যক্রম গ্রহণ করেন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মপ্রভাবিত যুবকগণ। হিন্দু সমাজ থেকে প্রায়শ বহিষ্কৃত বা বিচ্ছিন্ন এই সংস্কারকবৃন্দ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির ভিতর অধিকতর মানসিক সাযুজ্য ও সহমর্মিতার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল হন এবং সর্বাগ্রে নিজ স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীর শিক্ষা, মানসিক উৎকর্ষ ও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হন। স্ত্রীর সাহচর্যে মানসিক ভাববিনিময়ের আকাঙ্ক্ষাও তাঁরা অনুভব করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০ আগস্ট রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন সঙ্গীসহ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বেই ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন এবং ঐ সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকার সম্পাদকরূপে অক্ষয়কুমার দত্ত সমাজ সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলে সমাজের সংস্কারপন্থী ধারা বিশেষ গতিলাভ করে এবং কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একদল উৎসাহী তরুণব্রাহ্ম সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এই নব্য ব্রাহ্মদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী ছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল কেশব অনুগামী ব্রাহ্মদল তারকনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের খুল্লতাত) সম্পাদকতায় 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' স্থাপন করেন। ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের পরিপূরক হিসাবে অন্তঃপুরশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নারী কল্যাণে উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজন 'বামাবোধিনী সভা' গঠন করেন। সভার উদ্দেশ্যগুলি হল নারীগণের মানসিক উন্নতির জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে রচনা প্রাতিযোগিতার ব্যবস্থা ও পুরস্কারদান, বয়স্ক স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা এবং নারীজাতির উন্নতিতে সর্বপ্রকার সাহায্যদান।[১৬১] বামাবোধিনী সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পাঁচবছরের পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করে এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। বামাবোধিনী সভার উদ্যোগে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘ ষাট বছর পত্রিকাটি চলে। মহিলাদের রচনা নিয়মিত প্রকাশ করে এই পত্রিকা তাঁদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেয়। বামাবোধিনী সভার আদর্শে ঢাকায় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষা সভা' স্থাপিত হয়। এই সভা মহিলাদের শিক্ষাদান, পরীক্ষাগ্রহণ ও পুরস্কারদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ময়মনসিংহে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতকরী সভা' ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মিকা সভা' ও 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা' স্থাপিত হয়।[১৬২]

ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে কেশবচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত-সংস্কার সভা'

গঠন করেন। এই সভা অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রস্তাবও গ্রহণ করে। ১৮৭২ খ্রীষ্টব্দে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মপরিবারগুলির সম্মিলিত বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে বয়স্ক মহিলাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকগণ সেখানো পাঠদান করতে থাকেন। আশ্রমের ও বাইরের ব্রাহ্ম পরিবারের মহিলাগণ এখানে শিক্ষাগ্রহণ করতেন। এই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি, লজিক, দর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। বস্তুত কেশব পন্থী ব্রাহ্মগণ "গার্হস্থ্য শান্তির জন্য প্রবুদ্ধ স্ত্রী তৈরির ব্যবস্থা হিসাবে নারী শিক্ষাকে গণ্য" করেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী, অন্নদাচরণ খাস্তগির, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ 'পুরুষের সমভিত্তিতে ও সমপর্যায়ে' নারীশিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং ভারত আশ্রমের স্ত্রী শিক্ষায় তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না।[১৬৩]

মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত উচ্চশিক্ষাদানের জন্য "অবলাবান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত নারীহিতৈষী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি বন্ধুদের সাহায্যে এক উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আনেৎ অ্যাক্রয়েড নামে এক সুশিক্ষিত ইংরেজ মহিলার তত্ত্বাবধানে এই 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' পরিচালিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সিভিলিয়ান হেনরী বেভেরিজের সঙ্গে আনেৎ এর বিবাহ হলে বিদ্যলয়টি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' নামে পুনরায় খোলা হয়।

বঙ্গ মহিলা বিদ্যলয়ের ছাত্রী সরলা দাস (দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠ কন্যা, পরে মিসেস পি. কে. রায়) এবং কাদম্বিনী বসু (মনোমোহন ঘোষের মাতুলকন্যা, পরে দ্বারকানাথের স্ত্রী) দ্বারকানাথের তত্ত্বাবধানে এন্ট্রান্স পরীক্ষাদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পূর্বে একটি প্রারম্ভিক যোগ্যতানির্ণায়ক পরীক্ষা দিয়ে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশেষ কয়েকটি নিয়ম সাপেক্ষে পরীক্ষাদানের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে সরলার বিবাহ হয়ে যায় ও কাদম্বিনী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বঙ্গমহিলাবিদ্যালয় একটি বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও এখানকার শিক্ষার মান উন্নত ছিল। তুলনায় বেথুন বিদ্যলয়ের শিক্ষার মান প্রায় প্রাথমিক স্তরে ছিল। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ দুটি শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রীর সংখ্যা ছিল দশ এবং বিদ্যালয়ের সব ছাত্রীর মধ্যে মাত্র তারাই মোটামুটি শুদ্ধভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম।[১৬৪] বেথুন স্কুলের সভাপতি প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ ও সম্পাদক মনোমোহন ঘোষ উভয়ের পরামর্শে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগষ্ট বঙ্গমহিলা ও বেথুন এই দুটি বিদ্যালয় মিশে যায় এবং বেথুন বিদ্যালয় নামেই পরিচিত হয়।

সুতরাং কাদম্বিনী বসু বেথুন স্কুলের ছাত্রী হিসাবে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণহন। সর্বপ্রথম মহিলা হিসাবে এই ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কারণ দুই বছর পূর্বে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু অনিয়মিত ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষা দেন এবং

যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করলেও উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায় তাঁর নাম প্রকাশিত হবে না- মাত্র এই শর্তেই তিনি পরীক্ষাদানের অনুমতি প্রাপ্ত হন। একমাত্র ছাত্রী কাদম্বিনীর জন্য ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুলে কলেজ ক্লাসের সূচনা হয়। দেরাদুনপ্রবাসী খ্রীষ্টান ভুবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এন্ট্রান্সের সমপর্যায় উন্নীত বলে ঘোষণা করেন(১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনী যখন এফ. এ. পরীক্ষা দেন তখন চন্দ্রমুখীও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে এই পরীক্ষা দেন। উভয়েই কৃতকার্য হয়ে বেথুনে বি.এ. পড়তে থাকেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেথুন স্কুল ও কলেজ শুধু হিন্দু মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এই বছর থেকে বেথুন কলেজ জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব ছাত্রীর জন্যই উন্মুক্ত হয়। অতঃপর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম মহিলা স্নাতক হবার গৌরব অর্জন করেন। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তখনো মেয়েদের প্রবেশধিকার ছিল না।[১৬৫] ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে উপাচার্য হার্বার্ট জন রেনল্ড্স্ কৃতী ছাত্রী দুজনকে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন ভারতের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনার এক সুদূর প্রসারী শক্তিশালী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। এই ঘটনা শিক্ষায় নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা পুরুষের কর্তব্য হিসাবে নির্দেশিত করবে।[১৬৬]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাদম্বিনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং পাঠ শেষে সমস্ত বিষয়ে পাশ নম্বর পেলেও নারীশিক্ষাবিরোধী জনৈক অধ্যাপক তাঁকে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নম্বর না দেওয়াতে তিনি ডিগ্রিলাভ করতে পারেন না। কিন্তু অধ্যক্ষ কাদম্বিনীর দক্ষতা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই কাদম্বিনীকে তিনি চিকিৎসা করার জন্য বৈধ সনদ পত্র দেন এবং ইডেন হাসপাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্বেই তিনি দ্বারকানাথের সঙ্গে বিবাহিত হন। দ্বারকানাথ তাঁকে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত প্রেরণ করেন। এডিনবরা ও গ্লাসগো থেকে কয়েকটি ডিপ্লোমা লাভ করে কৃতবিদ্য হয়ে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৬৭]

চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত এবং উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী মেয়ের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কামিনী সেন ও সুবর্ণপ্রভা বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কামিনী বেথুন কলেজে ভর্তি হন, সুবর্ণপ্রভার বিবাহ হয়ে যায় বলে কলেজ ছাড়েন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অবলা দাস, কুমুদিনী খাস্তগির বেথুন বিদ্যালয় থেকে, ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র কানপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে, নির্মলা মুখোপাধ্যায় ফ্রিচার্চ স্কুল থেকে, প্রিয়তমা দত্ত আপার ক্রিশ্চান স্কুল থেকে, বিধুমুখী বসু (চন্দ্রমুখীর বোন) ডেরা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সমাবর্তন ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলার ডব্লু.ডব্লু. হান্টার জানান, বিগত বছরে তেইশজন মহিলা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন(পূর্ববর্তী বছরের ঠিক দ্বিগুণ), চারজন এফ.এ. পরীক্ষায়, তিনজন বি.এ. পরীক্ষায় (একজন অনার্সসহ এবং এই প্রথম কোনো মহিলার এই কৃতিত্ব অর্জন) উত্তীর্ণ হয়েছেন। চন্দ্রমুখীর ভগ্নী বিধুমুখী

বসু ও ভায়োলেট মেরী মিত্র ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মেডিক্যাল স্নাতক হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সমাবর্তন ভাষণে উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. এবং এম. এ. ডিগ্রিপ্রাপ্ত মহিলাগণকে অন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "No community can be said to be an educated community unless its female members are educated."[১৬৮] গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর মুখে উচ্চারিত এই মন্তব্য স্পষ্ট প্রমাণ করে যে হিন্দু সমাজেও নারী শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছিল। এতদিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিত মহিলারা সবাই ছিলেন খ্রীষ্টান অথবা ব্রাহ্ম। কিন্তু দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে এখন হিন্দু মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে থাকেন। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সাধারণত ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম প্রভাবিত মেয়েরাই অথবা খ্রীষ্টান মেয়েরাই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বেথুন স্কুল কলেজ, ভিক্টোরিয়া স্কুল কলেজ, লোরেটো হাউস ও লা মার্টিনিয়ার ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে, তবু ব্রাহ্ম মেয়েদের দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণায় ক্রমে হিন্দু মেয়েরাও প্রভাবিত হন। বস্তুত বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে এটাই ছিল ব্রাহ্মদের (এবং দেশীয় খ্রীষ্টানদেরও) শ্রেষ্ঠ অবদান---- বিষয়টি সম্বন্ধে মানুষের মূল্যবোধের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

উচ্চশিক্ষার ক্রমিক প্রবণতাবৃদ্ধি সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পরিবারের চিত্র। সরকারি বালিকাবিদ্যালয় ছিল দুটি। কলকাতায় বেথুন বালিকাবিদ্যালয় ও ঢাকাতে ইডেন বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত)। এছাড়া ফ্রি চার্চ, নর্মাল এবং ডবটন বালিকা বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া যেত। ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম বালিকাশিক্ষালয় স্থাপিত হয় এবং বাঁকিপুর (পাটনা) বালিকাবিদ্যালয় ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতি ছিল যথেষ্ট ধীর। অন্য দিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থাও মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় বাংলার অধিকাংশ বালিকাবিদ্যালয় মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে, বিশেষত কলকাতা শহরে অবস্থিত। ঢাকা জেলায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এছাড়া বাংলায় আর কোথাও বালিকাবিদ্যালয় নেই বললেই চলে। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকরা কন্যাদের শিক্ষা দিতে শুরু করেছেন, কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষার চেয়ে অন্তঃপুর শিক্ষাই এই শ্রেণীর মানুষরা বেশি পছন্দ করেন। কলকাতা, ঢাকা এবং মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি শহর ব্যতীত বালিকাবিদ্যালয় তো ছিলই না, বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য কোনো দাবিও ছিল না।[১৬৯] ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হান্টার কমিশন মন্তব্য করেন যে জনসংখ্যায় মোট নারীর অনুপাতের ভিত্তিতে পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রেসিডেন্সীতে বিদ্যালয় পাঠরত ছাত্রীর সংখ্যা বাংলা প্রেসিডেন্সীর তুলনায় অনেক বেশি। বাংলার শিক্ষাবিভাগের হিসাব অনুযায়ী বাংলার মোট নারীর সংখ্যা ৩৫ মিলিয়ন এবং বিদ্যালয়ে পাঠরত মেয়ের সংখ্যা ৪১০০০। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার সুযোগবৃদ্ধির জন্য কমিশনের কাছে দাবী উত্থাপন করা হয়। কমিশনের কাছে যে সতেরোটি স্মারক পেশ করা হয় তার মধ্যে ৮টি ছিল স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত এবং অধিকাংশ স্মারকই এসেছিল পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে বরিশাল,

ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, বিক্রমপুর এবং শ্রীহট্ট।[১৭০] অবশ্য ইতিমধ্যেই ১৮৭১-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ক্যাম্বেল পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্ত্রীশিক্ষায় সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন এবং সেই অনুসারে বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ৩৪৪, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০৪২ এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সংখ্যাটি হয় ২২৩৮। ছাত্রীসংখ্য বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৬৭১৭, ৪৪০৯৬ এবং ৭৮৮৬৫।[১৭১] ধীরে হলেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা বা বিরূপতা হ্রাস পাচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রগুলি ছাড়াও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য কতগুলি সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজেদের তত্ত্বাবধানে একটি 'বালিকাবিদ্যালয় পরিচালনা করা ছাড়াও হাওড়া ও হুগলীতে, পরে সমগ্র বর্ধমান বিভাগে এই সভা প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হয়। এই সভা প্রতিবছর জেলার বালিকাবিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং শ্রেষ্ঠ ছাত্রীদের পুরস্কৃত করে। শিক্ষাবিভাগের বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে এই সভার কার্যকলাপের সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সরকারি রিপোর্টে বলা হয় যে বর্ধমান বিভাগে উত্তরপাড়া হিতকরী সভাই স্ত্রীশিক্ষাসংক্রান্ত প্রধান প্রতিষ্ঠান। বয়স্ক নারীর শিক্ষার জন্য সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার আয়োজনও করে।[১৭২] এছাড়া পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা, ফরিদপুর সুহৃদসভা, বাখরগঞ্জ হিতকারী সভা, যশোহর ইউনিয়ন, বরিশাল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা, সিলেট ইউনিয়ন ইত্যাদি সভাগুলি অন্তঃপুরে থেকেও নির্বাচিত পাঠক্রম অনুযায়ী পরীক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্মিলনীগুলির পক্ষ থেকে হান্টার কমিশনের কাছে যে স্মারক প্রেরিত হয় তাতে বলা হয় যে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষা দিতে সম্মিলনীগুলিতে মোট ৫৫০ জন মহিলার বেশি উপস্থিত ছিলেন।[১৭৩]

স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত সংখ্যক স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী। বস্তুত মহিলাশিক্ষায়িত্রীর অভাব যে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের একটা প্রধান বাধা তা মিস মেরী কার্পেন্টার প্রথমেই উপলব্ধি করেছিলেন। সরকার বেথুন স্কুলে তদনুযায়ী স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ছাত্রীর অভাবে তিন বছর পরে তা উঠে যায়। ঢাকাতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারত সংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে আরো নর্মাল স্কুল সরকার নানা স্থানে খোলেন। তবু ১৩১২ বঙ্গাব্দের বামাবোধিনী পত্রিকার মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় জানানো হয় যে স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর যথেষ্ট অভাব। অনেক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষয়িত্রী পাচ্ছেন না।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে বামাবোধিনী পত্রিকার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও আরো কয়েকটি পত্রিকার অবদান উল্লেখযোগ্য। যথা-- গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মহিলা', শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এবং পরে তাঁর কন্যা বনলতা সম্পাদিত 'অন্তঃপুর',

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রথমে এবং পরে তাঁর ভগ্নী স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' ইত্যাদি। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষা তথা নারী উন্নয়নে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে।

হিন্দু সমাজের মতো মুসলিম সমাজেও মধ্যযুগের শেষভাগে এমন কয়েকজন বিদুষী ও প্রতিভাসম্পন্ন নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা সমাজের নারীপ্রগতিহীন ব্যবস্থার মূর্তিমান ব্যতিক্রম। ইরান দুখ্‌ত এবং তুরান দুখ্‌ত নামে ঢাকার শায়েস্তা খানের দুই কন্যা তাঁদের মার্জিত রুচি, শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষের জন্য বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। মালিকা নামে একজন মুসলিম মেয়ের কথা জানা যায় যে ঘোষণা করেছিল যে তর্কযুদ্ধে যে পুরুষ তাকে পরাজিত করবে তাকেই সে বিবাহ করবে। মালিকা তার প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে নারী প্রতিভার নাম এই সময়কার বঙ্গদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় তা হল কবি রহিমুন্নেসা। রহিমুন্নেসা 'পদ্মাবতী' পুঁথিনামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। পুঁথিটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। রহিমুন্নেসা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চট্টগ্রাম জেলার কোনো এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাড়িতে মাতার কাছে পড়াশোনা শেখেন। পরে তিনি পুরুষ 'গুরু'র কাছেও বিদ্যাশিক্ষা করেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়। তৎকালীন বাংলাসাহিত্যের নতুন রচনাশৈলী ও চতুঃস্পার্শ্বস্থ গ্রামীণ সংস্কৃতি, উভয়ের প্রভাব তাঁর কাব্যে দেখা যায়। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র পরিচিত মুসলিম মহিলা কবি রহিমুন্নেসা যথার্থ 'বাঙালি' কবি ছিলেন। তাঁর রচনা আরবী ফার্সীর প্রভাবে অধিক প্রভাবিত নয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কবি রহিমুন্নেসার মৃত্যু হয়।[১৭৪] উপরোক্ত উজ্জ্বল উদাহরণ গুলি সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয় পরে। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান শাসকদের পরাজিত করে। সুতরাং সমগ্র মুসলিম সমাজে প্রথমাবধি ইংরেজি সভ্যতা ও শিক্ষার প্রতি বিরূপতা ছিল। এই সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের প্রতিষ্ঠিত মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ এক সময় যে যাত্রার সূচনা করেছিল, নবাব আবদুল লতিফ ইত্যাদির চেষ্টায় বাংলা ও বিহারে তার সীমিত প্রসার আরম্ভ হয়। হুগলীর হাজি মহম্মদ মহসিন যে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করেন তার আয় মূলত মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্যই ব্যয়িত হত।[১৭৫] কিন্তু এই সাংগঠনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের কোনো স্থানই ছিল না। উপরন্তু পর্দাপ্রথার কঠোরতার জন্য মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের কথা কল্পনা করা যেত না। পর্দানশিন মুসলিম মহিলারা গৃহে শিক্ষালাভ করতেন এবং সাধারণত তা ছিল ধর্মীয় শিক্ষা। তবু জানা যায় যে অজ্ঞাতপরিচয় কোনো মুসলিম মহিলা শ্যামবাজার অঞ্চলে মিস কুকের শিক্ষাবিস্তারে কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের সেই প্রাথমিক যুগে মিশনারীদের স্কুলগুলিতে নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে এগিয়ে এসেছিল। উচ্চবর্ণ বা শরীফ ভদ্রসমাজের হিন্দু মুসলমান মেয়েরা নয়।[১৭৬]

এরই মধ্যে কয়েকজন মহিলার অবির্ভাব ঘটে যাঁরা নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন তোলেন এবং কঠোর পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। যেমন— তাহেরননেসা, ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩), করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬) ইত্যাদি। জমিদার মন্নুজানের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারির আয় থেকে খুলনার বয়রায় মেয়েদের স্কুল খোলা হয়। ১২৭১ সালের ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় তাহেরননেসার যে চিঠি প্রকাশিত হয় তাতে মেয়েদের বিদ্যাহীনতার দুঃখ ও বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত হয়েছে। তিনি ছিলেন বোদা বলিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর চিঠিতে তিনি জানান যে পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তিতেই একমাত্র সমাজ উন্নত হতে পরে। তাহেরননেসা প্রথম মুসলিম বাঙালি নারী গদ্য লেখক হিসাবে পরিগণিত হন। শিক্ষা ও মননে সফল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা অথবা পুরুষের অনুরূপ সাফল্য লাভ করার সুযোগ পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দেশিত সামাজিক পরিমণ্ডলে দুর্লভ। তার মধ্যেও যারা সফল হয়েছেন তাঁদের সাফল্য লাভের ধারা পুরুষের অনুরূপ নয়।[১৭৭] কুমিল্লা জেলার অন্তঃপুরবাসী ফয়জুন্নেসা নিজ চেষ্টায় কঠোর পর্দার মধ্যেই বাংলা ইংরেজী, ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্ম কালীচরণ দে'র সহায়তায় তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একটি বোর্ডিংসহ তিনি একটি বালিকাবিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। তিনি মেয়েদের জন্য মাসিক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন।

রংপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের করিমুন্নেসা খানম সবার অজ্ঞাতসারে ভাইদের পড়া শুনে পড়তে শেখেন এবং নিজের চেষ্টায় লিখতেও শেখেন। পিতা জানতে পেরে তাঁকে পড়াতে ইচ্ছুক হলেও ধর্মীয় সমাজপতি ও আত্মীয়দের বিরোধিতায় তিনি ব্যর্থ হন। বরং কন্যাকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিতে হয়। বিবাহের পর (টাঙাইলের গজনবী পরিবারে) করিমুন্নেসা দেবরদের সাহায্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বেগম রোকেয়ার জ্যেষ্ঠ ভগ্নী 'করিমুন্নেসা রোকেয়ার প্রাথমিক গৃহশিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার প্রথম প্রেরণাদাতা। তাছাড়া করিমুন্নেসা নিজেও কবি ছিলেন এবং তাঁর কাব্যকৃতির কিছু অংশ রোকেয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে আর একজন কবি সহিফা বানুর নাম উল্লেখযোগ্য। সহিফাবানু শ্রীহট্টের বিখ্যাত দার্শনিক কবি হাসন রাজার বৈমাত্রেয় ভগ্নী ছিলেন। আনুমানিক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুখ্যত সাধন-সঙ্গীত রচনায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং তাঁর রচিত সঙ্গীত গুলির সংকলন 'ছহিফা সঙ্গীত' নামে খ্যাত।[১৭৮]

মুসলমান মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ ঘটে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের উদ্যোগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। এর আগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিছু মুসলমান মেয়ে লেখাপড়া শিখলেও তাঁদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কিছু মুসলিম মেয়ে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে লেখাপড়া শেখেন ও বিদ্যালয় বোর্ডিংয়ে থাকেন। এই বিদ্যালয় থেকেই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সোফিয়া কাজি এন্ট্রান্স পাশ করেন ও বেথুন

কলেজে পড়ে বি. এ. পাস করেন। অতঃপর সোফিয়া স্কুল ইন্‌সপেক্ট্রেসের পদ গ্রহণ করেন ও বহুদিন কৃতিত্বের সঙ্গে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। সোফিয়া কাজি সেযুগের প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন ও কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেন।[১৭৯] ১৮৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার শিক্ষায়তনগুলিতে অন্য মেয়েদের তুলনায় মুসলিম মেয়ের সংখ্যার ন্যূনতার এক হিসাব পাওয়া যায় স্যার আজিজুল হক প্রণীত 'হিস্ট্রী অব প্রবলেমস্ অব মুসলিম এডুকেশন ইন বেঙ্গল' নামক গ্রন্থে-

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	মুসলিম মেয়ের হার
উচ্চ ইংরেজী বালিকাবিদ্যালয়	১৮৪	--	--
মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭,৪৫২	১৫৭০	৮.৯

তবে অন্তঃপুরে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী জানা যায় যে ৪০০ জন মুসলিম মহিলা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছেন। তৎকালীন পত্রিকা 'মিহির ও সুধাকর'এ মত প্রকাশ করা হয় যে গৃহেই যদি এমন শিক্ষালাভ সম্ভব তবে স্কুল খোলার প্রয়োজনীয়তা নেই। এতৎসত্ত্বেও ক্রমে এই সময় থেকে মুসলিম মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয় সচেতনতার সৃষ্টি হয়।[১৮০]

আব্দুল মজিদ, মৌলবী ফজলুল করিম, মৌলভী বজলুর রহিম, মৌলবী আব্দুল আজীজ প্রমুখ কয়েকজন উদার প্রগতিবাদী যুবক "ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁরা নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বিষয়ে উদার মত প্রচার করেন ও মুসলিম মেয়েদের জন্য অন্তঃপুর শিক্ষা ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী নানাভাবে নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণ বিষয়ে সচেতনতা জাগ্রত করতে থাকেন। নারীকে শিক্ষাবঞ্চিত রাখা, অবরোধের অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখা যে বিরাট অন্যায় এবিষয়ে সকলেই মত প্রকাশ করেন। কবি মোজাম্মেল হক, লেখক নজিবর রহমান, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, বুদ্ধিজীবী নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি এমদাদ আলী প্রমুখ আরো অনেকে নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণের বিষয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ বিষয়ে অবিরাম তীব্র লেখনীচালনা ছাড়াও

বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের ক্রমিক উন্নতি এবং বিভিন্ন সভা-সংগঠনের মাধ্যমে মতপ্রচার ইত্যাদির সাহায্যে মুসলিম নারীজাগরণকে বহুদূর অগ্রসর করেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মুসলিম নারী সমাজ উচ্চশিক্ষাগ্রহণে অধিকসংখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।

সূত্র নির্দেশ

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিদ্যাসাগর ঃ বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, কলিকাতা ১৩৭৬ ব, পৃঃ ১০৩

২. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নারী জাগরণ, কলিকাতা ১৩৫২ব, পৃষ্ঠা ১

কনক মুখোপাধ্যায়, ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা, কলিকাতা ১৯৯০, পৃঃ ২৩

৩. সুতপা ভট্টাচার্য, সে নহি নহি, বিশ্বভারতী ১৯৯০, পৃঃ ৬৭,

কনক মুখোপাধ্যায়, নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা, কলিকাতা ১৯৮৬, পৃঃ ৭-৮

৪. অশ্রুকুমার সিকদার, দেবেশ রায়(সম্পাদিত), দেবেশ রায়, দ্বিতীয় চেতনার নির্বাসনে, বিদ্যাসাগর - নির্বাচিত রচনা ঃ সাহিত্য ও সমাজ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১, পৃঃ ৬

৫. বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে ইংরেজি শিক্ষিত অমরনাথ বলেন-- ".....এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দেও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে – দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক....."। বঙ্কিম রচনাবলী ১ম খণ্ড, উপন্যাস, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৩৭২ বঃ, পৃঃ ৫০৭-৫০৮

৬. সোনিয়া নিশাত আমিন, 'নারী ও সমাজ', বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৬৮৭

৭. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত, সমাজ ও সাহিত্য কলিকাতা ১৩৯৪ বঃ পৃঃ ২১

ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাচীন ভারতে নারী, কলিকাতা ১৩৫৭বঃ পৃঃ২৭

৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত নং ১, পৃঃ ৮০-৮৪

৯. A. F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas And Social Change in Bengal (1818-1835) 2nd Edn. Calcutta 1976 P.128

১০. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা ১৯৮৯,পৃঃ ১০

১১. K.K. Dutta, A Social History of Modern India, New Delhi 1975, P.244

১২. স্বপন বসু, সতী, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮২, পৃঃ ১০৮

১৩. Sumit Sarkar, Modern India(1885-1947) Madras 1985, Pp. 54-55

১৪. K. K. Dutta, op.cit No. 11, pp. 244-255.

১৫. Ibid, p. 391

১৬. Ibid, p. 238

১৭. A. F. Salahuddin Ahmed, op.cit. No. 9, pp. 126-127.

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং২, পৃঃ ৩-৪

১৮. A. F. S. Ahmed, Ibid, p. 127

১৯. K.K. Dutta, op.cit. No. 11, p. 242

২০. A.F.S. Ahmed, op. cit No. 9. p. 129

২১. Ibid, p. 133

২২. K.K. Dutta, op,cit. No. 11, p. 248

২৩. স্বপন বসু, প্রাগুক্ত নং ১২, পৃঃ ১১২

২৪. A.F.S. Ahmed, op. cit. No. 9, p. 135

২৫. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ২

২৬. K.K. Dutta, op. cit. No. 11, p.239

স্বপন বসু, প্রাগুক্ত নং ১২, পৃ ১০৮

২৭. Kanailal Chattopadhyay, Brahmo Reform Movement, Some Social And Economic Aspects, Calcutta 1983 p. 12

কনক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ১৯

২৮. রামমোহন রচনাবলী, কলিকাতা ১৯৭৩, পৃঃ ১৭০-১৭১

২৯. তদেব, পৃঃ ১৯০-২০৩

রামমোহন রায়ের রচনা থেকে দেখা যায় তিনি গোঁড়া সমাজপতিদের দয়া ভিক্ষা করেননি বা তাদের সঙ্গে কোন আপস করেননি। তিনি মানুষের চিন্তাশক্তি ও মানবিকতার কাছে আবেদন রাখেন এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই মানবিকতা ও যুক্তিবাদ সংগ্রহ করেন। — কনক মুখোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর, কলিকাতা ১৯৮৬, পৃঃ ৩৪

৩০. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় সামাজিক বিবর্তন', ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল, মোহনলাল মিত্র ও কানাইলাল দত্ত সম্পাদিত, যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি, নিউব্যারাকপুর ১৯৭৪, পৃঃ ২৬০

৩১. K.K. Dutta, op. cit. No.11, p.258

A.F.S. ahmed, op. cit No. 9, p. 139

৩২. A.F.S. Ahmed , Ibid.

৩৩. Ibid, p. 140.

K.K.dutta, op. cit. No. 11, pp. 259-260.

৩৪. Sivnath Sastri, History of the Brahmo Samaj, vol.I., Calcutta 1911, p.54

A.F.S. Ahmed, op. cit No. 9, pp. 143-145.

৩৫. Susobhan Sarkar, Notes on the Bengal Renaissance, Calcutta 1979, p. 18

প্রভাতচন্দ্র, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ৯

৩৬. Lata Mani, Contentious Traditions : The Debate On Sati In Colonial India, Recasting Women, K. Sangari and S. Vaid(Ed), New Delhi 1989, pp 88-126

৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৭৭ ব, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮

K.K. Dutta, op. cit. No.11 p.265

৩৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলিকাতা ১৯৫৭, পৃঃ ১৬

রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত নং ১ পৃঃ ৮৮

বিনয় ঘোষ(সম্পাদিত), বেঙ্গল স্পেক্টেটর, জুলাই ১৮৪২, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬৪, পৃঃ ৯১

৩৯. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত নং ৭, পৃঃ ৩০

৪০. ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত নং ৭, পৃঃ ৫৪-৫৭

৪১. Michael Allen & S.N. Mukherjee Ed. M. Allen, 'The Hindu View of Women', Women In India And Nepal, Canberra 1982, p. 7.

৪২. Nirad c. Chaudhuri, Autobiography of An Unknown Indian, Jaico 1964, p. 222.

৪৩. Pundita Ramabai Saraswati, The High Caste Hindu Woman, first Published 1888, reprint New Delhi 1984 pp. 69-70.

৪৪. আর রীড, ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে কলকাতা, (অনুঃ) পরিমল গোস্বামী কলিকাতা ১৩৭৩ ব, পৃঃ ১০০

৪৫. নিস্তারিণী দেবী, সেকেলে কথা, আত্মকথা, নরেশচন্দ্র জানা সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮২, পৃঃ ৩২-৪৯

৪৬. আর রীড, প্রাগুক্ত নং ৪৪

৪৭. তদেব, পৃঃ ৯৬-৯৮

৪৮. Pundita Ramabai, op. cit. No. 43, p.86.

৪৯. গোলাম মুরশিদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫৪-১৮৭৬) ঢাকা ১৯৮৪, পৃঃ ১৬-১৭

আর রীড, প্রাগুক্ত নং ৪৪

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী, কলিকাতা ১৩৯৯ ব, পৃঃ ৮৯

৫০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাচার দর্পণ, ২১ অক্টোবর, ১৮৩৭, প্রাগুক্ত নং ৩৭, পৃঃ ২৬৩-২৬৪

৫১. তদেব, পৃঃ ২৫৬-২৫৮

৫২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত নং ১, পৃঃ ১৩০

গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত নং ৪৯, পৃঃ ২০

বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৬ ব, পৃঃ ১৬৯

৫৩. Gautam Chattopadhyay, Awakening in Bengal in early 19th. Century, Calcutta 1965, pp 103-104

৫৪. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত), 'বিধবার পুনর্বিবাহ', বেঙ্গল স্পেক্টেটর, এপ্রিল ১৮৪২, প্রাগুক্ত নং

৩৮, পৃঃ ৭৭-৮০

৫৫. তদেব, পৃঃ ৩০, ৯১, ৯২

৫৬. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ২৬-২৭

৫৭. Sitanath Tattwabhushan, Social Reform In Bengal, Calcutta 1982, pp. 73-74

রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত নং ১, পৃঃ ১৩১

৫৮. প্রভাতচন্দ্র, প্রাগুক্ত নং ৫৬, পৃঃ ২৭, ৩২-৩৩,

K.K. Dutta, op. cit. No. 11, P. 285,

বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত নং ৩৮, পৃঃ ৫৩৫-৫৫৪

৫৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত নং ৩৮, পৃঃ ১৬৭-১৬৯

৬০. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৯৫২, পৃঃ ১১৩

৬১. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২ , পৃঃ ২৬

৬২. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত নং ৫৪, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬৩, পৃঃ ১৬২-১৭০

৬৩. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৬ ব, পৃঃ ১৯০-১৯৯

৬৪. তদেব, পৃঃ ২০০-২০৩

৬৫. বিনয় ঘোষ,প্রাগুক্ত নং ৬২, পৃঃ ১৯৭ এবং প্রাগুক্ত নং ৬৩, পৃঃ ২১১-২১৫, রাজনারায়ণ বসু, প্রাগুক্ত নং ৬০, পৃঃ ৯৮-৯৯

৬৬. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩য়খণ্ড, সম্পাদকীয়, পৃঃ ৩৩-৩৮,সম্বাদ ভাস্কর, সম্পাদকীয়, ২রা ডিসেম্বর ১৮৫৬, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৬

চিঠি পত্র, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৫৬, পৃঃ ৩৫২-৩৫৪

সম্পাদকীয়, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫৬, পৃঃ ৩৫৪-৩৫৭

চিঠিপত্র, ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৫৬, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮

সম্পাদকীয়,৩১ জানুয়ারী ১৮৫৭, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৬

৬৭. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ৩৪

৬৮. Hiren Gohain, The Idea of Popular Culture In The Early Nineteenth Century, Calcutta 1991,p. 27.

৬৯. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত নং ৬৩, পৃঃ ২২৮-২২৯

৭০. Sumit Sarkar, ACritique of Colonial India, Calcutta 1985, p. 62

৭১. Pundita Ramabai, op. cit. No. 43 pp. 91-93.

আর রীড, প্রাগুক্ত নং ৪৪, পৃঃ ৯৮-৯৯

৭২. Report On The Administration of Bengal 1911-1912, Calcutta 1913.

৭৩. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত নং ১০ পৃঃ ৯-১০, ৫২.

৭৪. গুরুচরণ মহলানবিশ, আত্মকথা, প্রাগুক্ত নং ৪৫, পৃঃ ৪০-৪৪, ৮৪-৮৫, কৃষ্ণকুমার মিত্র,

আত্মচরিত, কলিকাতা ১৩৮১ ব, পৃঃ৬৫-৬৬

৭৫. মনোদাদেবী, জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃঃ ২৫

৭৬. গোপাল হালদার, রূপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৭৮, পৃঃ ২৫৬-২৫৭

৭৭. বিদ্যাসাগর, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার', অশ্রু কুমার শিকদার, প্রাগুক্ত নং ৪, পৃঃ ৭৫-৭৮

৭৮. N.K. Sinha (Ed), Administrative, Economic and social History', the History of Bengal, University of Calcutta, 1967, pp. 76, 88-105

৭৯. N.K. Sinha, The Economic History of Bengal, Vol. II, Calcutta 1968, pp. 33-65, 114-115, 123-124.

৮০. S.K. De, Bengali Literature In The Nineteenth Century (1757-1857) 2nd. Edn. Calcutta 1962, pp. 26-27.

৮১. বিদ্যাসাগর, প্রাগুক্ত নং ৭৭, পৃঃ ৭৯-৮০

৮২. L.S.S. O'Malley & Manmohan Chakraborty (Ed) District Gazetteer, Hooghly, First Published 1912 reprint, New Delhi 1985, P. 100.

৮৩. প্রসন্নময়ী দেবী, পূর্কথা, কলিকাতা ১৯৮২, পৃঃ ৪

৮৪. নিস্তারিনীদেবী, প্রাগুক্ত নং ৪৫, পৃঃ ৬-৭

৮৫. 'কুলীন বহুবিবাহ' (কবিতা) ঃ বামাগণের রচনা, বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১২৭৮, পৃঃ ২৯০

৮৬. Tapan Ray Chaudhury, 'Norms of Family Life And Personal Morality Among The Bengali Hindu Elite', Aspects of Bengali History And Society. Rachel Van, M Baumer (Ed). Delhi 1976, pp. 17-18

৮৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১লা ভাদ্র ১৭৬৭ শকাব্দ, পৃঃ ২০৫

৮৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৩৫৯ব, পৃ ১৩৪-১৩৬,

জনৈক কুলীন স্ত্রীর চিঠি, বিদ্যাদর্শন, বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত নং ৩৮, পৃঃ ৫৭১-৫৭২

৮৯. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ৫৮

গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত নং ৪৯, পৃঃ৯৯

৯০. Quoted From K. M. Banerjee, 'Kulin Plolygamy," p. 142,

গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত নং ৪৯, পৃঃ ১০০

৯১. গুরুচরণ মহলানবিশ, প্রাগুক্ত নং ৭৪, পৃঃ ১৩-১৪

৯২. তদেব

৯৩. দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃঃ ৩৩৬ ,

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ২০-২২

৯৪. Amitabha Mukherjee, Reform And Regeneration In Bengal, 1774-1823, Calcutta 1968, p. 340

৯৫. Gautam Chattopadhyay, op. cit. No. 53, pp. 89-105

৯৬. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত নং ৬৩, পৃঃ ২৩৩-২৩৬,

গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত নং ৪৯, পৃঃ ১০৫

৯৭. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত নং ৫২, পৃঃ ২৩৬-২৩৯

৯৮. তদেব, পৃঃ ২৩৯-২৪৩

৯৯. সম্বাদ ভাস্কর, চিঠিপত্র, ১৬ আগস্ট ১৮৫৬, পৃঃ ৩২১-৩২২, সম্পাদকীয়, ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯ সময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ৩য় খণ্ড, কলিকাতা

১০০. বিদ্যাসাগর, প্রাগুক্ত নং ৭৭ পৃঃ ৭০,৭৯

১০১. 'বহুবিবাহ হওয়া উচিত কিনা,' সোমপ্রকাশ, ৩০ শ্রাবণ ১২৭৮, 'বহুবিবাহ', সোমপ্রকাশ, ১৩ ভাদ্র ১২৭৮, সম্পাদকীয় উত্তর, তারানাথ তর্কবাচস্পতির চিঠি, ১৩ ভাদ্র কৈলাসনাথ বসুর চিঠি, ১৩ ভাদ্র, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা ঃ কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণার্থ গবরমেন্টের আবেদন, ২০ই অষাঢ় ১২৭৮, সময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬৬, পৃঃ ২৩৭-২৫৩.

১০২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বহুবিবাহ', বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ', কলিকাতা ১৯৭৩ খ্রীঃ ৪০৩-৪০৯

১০৩. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত নঃ ৬৩, পৃঃ ২৫৪-২৫৫,

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, নরেশচন্দ্র জানা (সম্পাঃ) আত্মকথা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮২

১০৪. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত নং ৪৯, পৃঃ ১০৯-১১২

১০৫. বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১২৭৭, পৃঃ ২৭২

বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১২৯৮, পৃঃ ২৮৫

১০৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত নং ৩৮, পৃঃ ২৭৮

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ৫৯, ৬২-৬৪

১০৭. Bhabani Bhattacharya, Socio Political Currents In Bengal, A Nineteenth Century Perspective, New Delhi 1980, p.73

১০৮. P. Sinha, Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History, Calcutta 1965, p. 78

১০৯. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত নং ১০ পৃঃ ৫২

১১০. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত নং ৪৯, পৃঃ ১৫৪-১৫৬

১১১. বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১২৭৭ বঃ, পৃঃ ২২১-২২

মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, ২য়খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৭ পৃঃ ৮৯-৯১.

১১২. ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত নং ৭, পৃঃ ৩৮

Michael Allen, op. cit. No. 41, p.6

১১৩. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, আত্মজীবনচরিত, আত্মকথা, ১ম খণ্ড, নরেশচন্দ্রজানা (সম্পাঃ) কলিকাতা ১৯৮১, পৃঃ ৪৭,

১১৪. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৪ বঃ, পৃঃ ১০০

১১৫. দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল, ঊনিশশতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত নং ৩০, পৃঃ ২২৭.

১১৬. বেঙ্গল স্পেক্টেটর, মে ১৮৪২ বিদ্যাদর্শন, কার্তিক ১৭৬৪ শক, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪-১৮৫, ৫৭১-৫৭৪.

১১৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্য সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী ১৯৫৮, পৃঃ ৭৪

১১৮. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত নং ৪৯, পৃঃ ২০৭

১১৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাদ্র ১২৮৬, পৃঃ ৭৯

১২০. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত নং ৩৮,পৃঃ ২৭৭

মুনতাসীর মামুন, ঊনিশশতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, ২য় খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৭, পৃঃ ১৮৪

১২১. Sivnath Sastri, History of The Brahmo Samaj, op. cit. No34,p.249

১২২. K.K. Dutta, op. cit. No 11, pp. 314-315

১২৩. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত নং ৬০, পৃঃ ২০০

শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, প্রাগুক্ত নং ৩৮, পৃঃ ২৭৩

১২৪. রাজনারায়ণ বসু, তদেব, পৃঃ ২০৯

১২৫. ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পারিবারিক প্রবন্ধ,কলিকাতা, পৃঃ ২

১২৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত নং ১ পৃঃ ১৩৬

১২৭. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত নং ১১, পৃঃ ২৬

কিন্তু ঢাকা গেজেট জানায় যে মুসলমানরা তাদের সামাজিক রীতিনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ সহ্য করবেনা।

— মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত নং ১১১, পৃঃ ৯৮

১২৮. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ৩০, পৃঃ ২৬৩

P. Sinha, op. cit.No. 108, p. 128

মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত নং ১১১, পৃঃ ৮৪

১২৯. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সমাজ সংস্কার', প্রাগুক্ত নং ৩০, পৃঃ ২৪৩

১৩০. বিদ্যাসাগর, অশ্রুকুমার সিকদার/দেবেশ রায়, প্রাগুক্ত নং ৪, পৃঃ ১১৬

১৩১. Bhabani Bhattacharya, op. cit. No. 107, p.70

১৩২. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত নং ৮৮, পৃঃ ১৪২

১৩৩. Report On The Census Of India, 1901, Calcutta 1902, p. 266

Report On The Administration of Bengal, 1911-12,

Details of The Last Census, 1911, Calcutta 1913. p. 111

১৩৪. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্ত নং ১১, পৃঃ ৫২-৫৩

১৩৫. তদেব, পঃ ৪২, ৫৩

১৩৬. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত নং ৭, পৃঃ ৩৪

১৩৭. Muhammad Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. I., Karachi 1963, pp. 203-204.

সত্যবতী গিরি, 'মধ্যযুগে বাংলার ভাষা ও সাহিত্য', মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, অনিরুদ্ধ রায়/ রত্মাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা ১৯৯২, পৃঃ ২২৫

রীণা ভাদুড়ী, 'মধ্য যুগে বাংলার নারী ভাবনা ও নারীর স্থান ঃ সাহিত্য ও সমাজে', ভারত ইতিহাসে নারী, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়/ গৌতম নিয়োগী (সম্পা) কলিকাতা ১৯৮৯, পৃঃ ২৩

১৩৮. Sitanath Tattwabhusan, Social Reform In Bengal, op.cit. ;No. 57 p. 69

রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, কলিকাতা ১৩৫৮ব, পৃঃ ৫৯

১৩৯. Sitanath Tattwabhusan, op. cit No. 138, pp. 68-69

১৪০. কৈলাসবাসিনী দেবী, 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি', কলিকাতা ১৮৬৫, পৃঃ ১৩-১৪

১৪১. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'উনবিংশশতকের বাঙালী সমাজ ও রাজা রাধাকান্ত দেব', দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা ঃ রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৭-১৯৮৪) কলিকাতা ১৯৮৫, পৃঃ ২০

১৪২. ভারতী রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ' ভারত ইতিহাসে নারী, প্রাগুক্ত নং ১৩৭, পৃঃ ৪২

১৪৩. রামমোহন রচনাবলী, প্রাগুক্ত নং ২৮, পৃঃ ২০২-২০৩

১৪৪. গৌতম নিয়োগী, 'ছিলে সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী', শারদীয় দেশ ১৩৯৩ ব, পৃঃ ৪৪৩.

১৪৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, কলিকাতা ১৩৫৭ব, পৃঃ ৩-৭

১৪৬. Jogesh Chandra Bagal, Women Education In Eastern India, Calcutta 1956, pp.23-24

১৪৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত নং ১৪৫, পৃঃ ১৪

১৪৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'একটি বৈপরিত্যের সন্ধানে' দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত নং ১৪১ পৃঃ ৩৫

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি', তদেব, পৃঃ ৪১

যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, পৃঃ ৪

১৪৯. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা, কলিকাতা ১৮৬৩, পৃঃ ∕৹ – ৵৹

গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা, আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া, ঢাকা ১৯৮৫, পৃঃ ২২

১৫০. নিস্তারিণী দেবী, সেকেলে কথা, প্রগুক্ত নং ৪৫, পৃঃ ৪৪-৪৫

১৫১. সোনিয়া নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, প্রগুক্ত নং ৬, পৃঃ ৬৯১

১৫২. Mahesh Chandra Deb, A Sketch of The Condition of Hindoo Women, Awakening In Bengal, Gautam Chattopadhyay(Ed) Calcutta 1965, p.90

১৫৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত নং ১৪৫, পৃঃ ৩০-৩১

১৫৪. Sumit Sarkar, A Critique of Colonial India, op. cit. No. 70, pp. 27, 73

সুবীর রায়চৌধুরী, হেনরী ডিরোজিও, তাঁর জীবন ও সময়, নয়াদিল্লি ১৯৯৩, পৃঃ ৮৪

১৫৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত নং ১৪৫, পৃঃ ৩২

১৫৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, প্রাগুক্ত নং ৩৮ পৃঃ ১৩৬

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ২৫-২৬,২৯,৩২

রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত নং ১ পৃঃ ১১৬

১৫৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাগুক্ত নং ১৫৫

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ১৭

১৫৮. Jogesh Ch. Bagal, op. cit. No. 146, pp. 79-95

যোগেশচন্দ্র, তদেব, পৃঃ ৩৩-৪৯

১৫৯. গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা, প্রাগুক্ত নং ১৪৯, পৃঃ ২৫

১৬০. বিনয় ঘোষ, সময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬২, পৃঃ ৩১০-৩১২, ৩১৬

কৈলাসবাসিনী দেবী, প্রাগুক্ত নং ১৪০, পৃঃ ১২

১৬১. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২ পৃঃ ৪৩-৪৪

শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত নং ১৫৬, পৃঃ ৯৮,২২১, ২২৩

ভারতী রায়, ভূমিকা, সেকালের নারীশিক্ষা, বামাবোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা ১৯৯৪, পৃঃ ২৫

শিবনারায়ণ রায়, নারীমুক্তি, আধুনিকতা, বামাবোধিনী, দেশ, ৩০ জুলাই ১৯৯৪, পৃঃ ১২২-১২৩

১৬২. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্তনং ১১, পৃঃ ৪১,

শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রগুক্ত নং ১৫৬, পৃঃ ২৭৭

১৬৩. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ৫১, ৬৪

শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত নং ৮৮, পৃঃ ১১৪-১১৫

শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত নং ১৫৬, পৃঃ ২৪৬-২৪৭, ৩০০

১৬৪. Ashim Kumar Dutta, 'Brahmo Samaj And Women's Education In The Nineteenth Century' বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৮৭৯-১৯৭৯, কলিকাতা ১৯৮০, পৃঃ ১৫০

১৬৫. নলিনী দাস,'কাদম্বিনী বসু', তদেব, পৃঃ ১

১৬৬. Hundred Years Of The University of Calcutta, (1857-1956), Calcutta 1957, pp. 22-23

১৬৭. গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহ্বলতা, প্রাগুক্ত নং ১৪৯,পৃঃ ৩৯

১৬৮. op. cit. No. 166, p. 147

১৬৯. Report On The Administration of Bengal, 1872-1873, Calcutta 1873, p.148

১৭০. op. cit. No. 168

১৭১. গোলাম মুরশিদ 'সংকোচের বিহ্বলতা', প্রাগুক্ত নং ১৪৯, পৃঃ ৩৩

১৭২. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্য সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী ১৯৫৮, পৃঃ ৭৬-৭৭

১৭৩. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত নং ২, পৃঃ ৭৮-৮০

১৭৪. সোনিয়া নিশাত আমিন, প্রাগুক্ত নং ৬, পৃঃ ৬৮৪-৬৮৫

১৭৫. Suresh Chandra Deb and Amal Home, "The Rise And Fulfilment of Indian Nationalism'-- Calcutta Municipal Gazette, 23rd. anniversary And Independence Commemoration Number, Calcutta 1947, p.12

১৭৬. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত নং ১০, পৃঃ ৪২-৪৩

১৭৭. যশোধরা বাগচী, 'নারীমুক্তিবাদী জ্যোতির্ময়ী দেবী', অ াকাদেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, মে ১৯৯০, কলিকাতা, পৃঃ ১৬৪

১৭৮. মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়া, জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা ১৯৮৬, পৃঃ ২০-২১, ৫৬

মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত নং ১০, পৃঃ ৪৫-৪৬

১৭৯. রমা নিয়োগী (সম্পাদিত) ব্রাহ্মবালিকা শি ক্ষালয় শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ (১৮৯০-১৯৯০) কলিকাতা ১৯৯৪, পৃঃ ৮৪

১৮০. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, প্রাগুক্ত নং ১০, পৃঃ ৪৭-৪৯